# অগুরু

—বার্ষিক [illegible]

শ্রীঅমিয় কু … সম্পাদিত

ঘোষ মিত্র এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১০।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফাল্গুন—১৩৪৪

প্রকাশক—
শ্রীঅমলকৃষ্ণ মিত্র
ঘোষ মিত্র এণ্ড কোং,
১০।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম এক টাকা

প্রিণ্টার—বি, এন, ঘোষ।
আইডিয়াল প্রেস।
৮১।১ মসজীদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

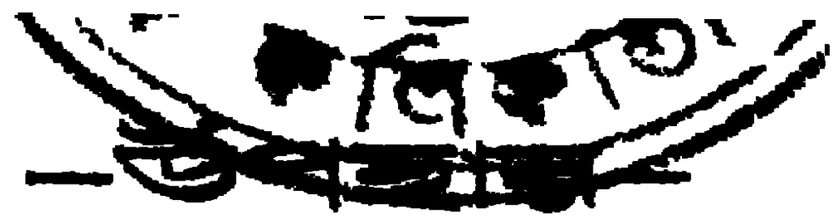

# —বিষয় সূচী—


| | | |
|---|---|---|
| ক্ষণিকের অতিথি | ( কবিতা ) | শ্রীনরেন্দ্র দেব। |
| মিলন | ( গল্প ) | শ্রী সরোজ নাথ ঘোষ। |
| চিঠির চটী | ( গল্প ) | শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| গব্বী | ( কবিতা ) | শ্রীগিরিজা কুমার বসু। |
| চক্র | ( গল্প ) | শ্রীফণীন্দ্র নাথ পাল। |
| আরো গিষ্টি করে' | ( কবিতা ) | শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু। |
| কিংশুক | ( গল্প ) | শ্রীশান্তা মিত্র। |
| দ্বারী | ( রূপক ) | শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ। |
| চিত্রকর | ( গল্প ) | শ্রীসুধীন্দ্র কুমার দেব। |
| আদেশ | ( গল্প ) | শ্রীমুণীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। |
| ব্যর্থ বর্ষা | ( কবিতা ) | শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। |
| বিধির বিধান | ( গল্প ) | শ্রীনলীন্দ্র দেব। |
| সম্বন্ধ ভঙ্গ | ( চিত্র ) | শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসু। |
| কুয়াশা প্রভাত | ( কবিতা ) | শ্রীলীলা দেবী। |
| অশ্রুজলের পদ্ম | ( গল্প ) | শ্রীঅমিয় কুমার মিত্র। |
| শরতের গান | | শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল। |
| ভবিতব্য | ( গল্প ) | শ্রীরাধারাণী ঘোষজায়া। |

# অগুরু

## ক্ষণিকের অতিথি

তোমারে চাহিয়াছিনু বাঁধিয়া রাখিতে
বন্দী করি এ বাহু-বন্ধনে
চপল-অঞ্চলা,
তুমি যে পারোনা কভু অচল থাকিতে
ধরণীর আনন্দ-নন্দনে
হে চির-চঞ্চলা।

একথা জানিত মন, তবু সব ভুলে
চেয়েছিনু তোমারে বাঁধিতে
অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে,
ভাবি নাই কোনোদিন জীবনের কূলে
একা মোরে হবে গো কাঁদিতে
তিতি-অশ্রুজলে !

তুমি চলে যাবে—এটা ভুলেও স্বপনে
কল্পনায় পারিনি আনিতে :
ছিল গো ধারণা—

ভালবাসিয়াছ যারে, কভু তার মনে
হেন বজ্র-বেদনা হানিতে
তুমি তো পারোনা।
সেদিন বুঝিনি আমি, তুমি এসেছিলে
ক্ষণিকের আনন্দ বহিয়া
লীলাভরে কত,
অনুরাগে নিমেষের তৃপ্তি শুধু দিলে
এ জীবনে জড়িত রহিয়া
প্রেয়সীর মতো।

যাত্রী মোরা যুগে যুগে জীবনের পথে,
কোন্ তীর্থে নাহি জানি
ফুরাবে এ গতি,
কান্তপথে বহুদূর চলি কোনমতে
ধরেছিনু তব পদ্মপাণি
ওগো আয়ুষ্মতী!

সেদিন চলার পথে শ্রান্তিটুকু মম
বহুযত্নে করেছিলে দূর
প্রাণপণে সেবি,
দিয়েছিলে কাণে কাণে 'প্রিয়—প্রিয়তম'
সুধা ঢেলে অধরে মধুর
কে তুমি গো দেবী ?

# মিলন।

( ১ )

"বাপ জান্, বাচ্চাকে একটু ধর্, আমি আস্‌ছি।"

ছয় বৎসরের বালক রহমৎ তাহার বলিষ্ঠ বাহুযুগলের সাহায্যে মুকুলিত পদ্মের ন্যায় সুন্দরী একবৎসরের বালিকাকে তাহার মসিকৃষ্ণ বুকের উপর তুলিয়া লইল। মেঘের কোলে বিদ্যুতের একটা স্থির রেখা কে যেন আঁকিয়া দিল।

বালক কত অর্থহীন কথা উচ্চারণ করিয়া শিশুর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় রহমতের জননী একটি পেয়ালা ভরিয়া উষ্ণদুগ্ধ লইয়া তথায় ফিরিয়া আসিল।

রোরুদ্যমানা বালিকাকে কোলের উপর শোয়াইয়া দিয়া রহমৎ তখন তাল মান লয় হীন শিশুকণ্ঠের সঙ্গীতের দ্বারা তাহাকে ভুলাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল।

মাতা বলিল, "এই যে আমি এসেছি, খুকীকে আমার কাছে দে।"

বালক বলিল, "না মা, আমি ওকে দুধ খাইয়ে দেব।"

মাতা হাসিয়া বলিল, "দূর্ পাগল ছেলে, তুই পার্‌বিনে"

অনেক প্রকারে বুঝাইয়া পুত্রের ক্রোড় হইতে মাতা শিশুকে তুলিয়া লইল।

এই শিশু কন্যাটি ইরাকের নরপতি সর্দ্দার মোয়াজিমের সন্তান। প্রসবের পর প্রসূতির মৃত্যুঘটায় সর্দ্দার শিশুর পালনভার ধাত্রী রহমৎ-জননীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। রহমতের মাতার কিছুদিন পূর্ব্বে

একটি-কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার স্বামীও অল্পদিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। সর্দ্দার মোয়াজিম এই ক্রীত-দাস দম্পতিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রহমতের মাতার বক্ষে দুগ্ধ-ধারা ছিল—তাঁহার মাতৃহারা কন্যা এই বিশ্বস্তা ক্রীতদাসী—ধাত্রীর পরিচর্য্যায় মানুষ হইয়া উঠিবে এ আশা মোয়াজিমের ছিল। শুদ্ধান্তঃ-পুরের একপ্রান্তে উদ্যান সমীপবর্ত্তী কতিপয় কক্ষে রহমৎ ও তাহার মাতা আশ্রয় পাইয়াছিল।

বালক রহমৎ, সর্দ্দার নন্দিনীকে সর্ব্বক্ষণ কোলে লইতে পারিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পড়িত। তাহার সদ্যোজাতা ভগিনীর অকাল মৃত্যুর জন্য, রহমতের জাগ্রত ভ্রাতৃস্নেহ প্রভু কন্যার উপর চরিতার্থতা লাভ করিতেছিল। শিশুর নামকরণ হইয়াছিল রাবেয়া। রহমৎ একদণ্ডও রাবেয়াকে নয়নের অন্তরাল করিতে চাহিত না। শৈশবের স্বপ্নস্বর্গে সে রাবেয়াকে রাণীর মত ভাবিয়া স্নেহ ও প্রীতির অর্ঘ্যে পূজা করিত।

( ২ )

বসন্তের প্রভাতে চারিদিক ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ইউফ্রে-টিস্ ও টাইগ্রীস্ নদীর সঙ্গমস্থলের বিস্তীর্ণ—সীমাহীন জলরাশি দিকচক্র বালে মিলাইয়া গিয়াছে। নদীর তীরবর্ত্তী রাজোদ্যানে প্রকৃতির রঙ্গিণী মূর্ত্তি, মনোলোভা শোভা! সর্দ্দারের প্রাসাদশীর্ষে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইতেছে। প্রাসাদ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণী টাইগ্রীস নদীর গর্ভে নামিয়া গিয়াছে। সর্দ্দারের সুদৃশ্য বজরা সোপানের একপার্শ্বে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে।

পুষ্পভারাবনত একটি বৃক্ষের একটি শাখা নত করিয়া পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর রহমৎ দশমবর্ষীয়া রাবেয়ার জন্য কিছু পুষ্পচয়ন করিতেছিল।

প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে বালিকা অদূরে দাঁড়াইয়া রহমতের কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। নিকটে তখন কেহই ছিলনা।

পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর হইলেও রহমতের দেহে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চার অভ্রান্ত পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মাংসপেশীবহুল বলিষ্ঠ বাহুযুগল, কপাটবক্ষ তাহার নিকষকৃষ্ণ দেহের ঔজ্জ্বল্য ও শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। সুখভোগলালিতা সর্দ্দার নন্দিনীর সুগৌর দেহেও বসরাই গোলাপের দীপ্তি ক্রমেই স্ফুটতর হইতেছিল।

সুন্দর একটি তোড়া বাঁধিয়া রহমৎ সসম্ভ্রমে উহা লইয়া রাবেয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাবেয়া, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশৈশব সহচর, অনুগত ও ভক্ত রহমৎকে ভ্রাতৃজ্ঞানে স্নেহ করিত। তবে সে যে ইরাকের সর্দ্দারের কন্যা, আভিজাত্য, পদমর্য্যাদা এবং রূপগৌরব তাহার যে অসামান্য এই বোধশক্তি ধীরে ধীরে তাহার কিশোর মনের একপ্রান্তে যে সমুদিত হইতেছিল তাহা তাহার ব্যবহারে সময় সময় প্রকাশ না পাইত এমন নহে।

রহমতের প্রসৃত করপল্লব হইতে পুষ্পগুচ্ছ লইয়া রাবেয়া চঞ্চলচরণে উদ্যানপ্রান্তে ছুটিয়া গেল। রহমতও, প্রভুর অনুগামী বিশ্বস্ত কুকুরের ন্যায় তাহার অনুগামী হইল।

প্রভাত আলোকের দীপ্তচ্ছটা তখন দিগন্তবিস্তৃত উচ্ছ্বল জলরাশির উপর নৃত্য করিতেছিল। বালিকা দিকচক্রবালে মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "রহমৎ, ঐ যে জলের মধ্যে অনেক দূরে একটা কালো জিনিষ দেখা যাচ্ছে ওটা কি জান?"

রহমৎ বলিল, "ওটা একটা দ্বীপ।"

"ওখানে কি আছে?"

"শুনেছি কিছু নেই, [illegible] পাহাড়।"

"ওখানে মানুষ আছে ?"

"না, শাহজাদি, মানুষ জানোয়ার কিছুই ওখানে নেই।"

বালিকার কৌতূহল ইহাতে নিবৃত্ত হইল না। সে তাহার চপল নয়নযুগল রহমতের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "ওখানে যাওয়া যায় না ?"

"যায়, নৌকো করে।"

বালিকা কয়েক মুহূর্ত্ত কৃষ্ণবর্ণ দ্বীপের দিকে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া রহিল। জ্ঞান সঞ্চারের পর হইতে, উদ্যানে বেড়াইবার সময় কতবার ঐ সুদূরবর্ত্তী দ্বীপটিকে সে দেখিয়াছে,উহা কি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মিয়াছে, কিন্তু খেলায় ভুলিয়া কাহাকেও সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার মনে হয় নাই। আজ বসন্তপ্রভাতে, জলবিস্তারের মধ্যে দ্বীপটি-. . কোন মায়ারাজ্যের একটা বিচিত্র পদার্থের ন্যায় মনে হইতেছিল।

"আচ্ছা রহমৎ, তুমি ওখানে কখন গিয়েছ ?"

"না, শাহজাদি। ওখানে যা'র তা'র যাবার হুকুম নেই। যে সর্দ্দারের বিষ নজরে পড়ে, রাজদ্রোহী হয়, তাকে ওখানে বন্দী করে রাখা হয়।"

বালিকা সবিস্ময়ে রহমতের দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহার কোমল হৃদয় দ্বীপটিকে আর অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে বলিল, "তবে ত ওটা বড় খারাপ জায়গা। না, আমি ওখানে যেতে চাইনে।"

রহমত মৃদু হাসিয়া বলিল, "শাহজাদির ওখানে যাবার ত কোন দরকার হবেনা। ও জায়গা দুষমনদের শাস্তির জন্য।"

শুষ্ক পত্র মর্ম্মরের শব্দে রহমৎ সহসা পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। স্বয়ং সর্দ্দার মোয়াজিম্ খাঁ, এত সকালে এখানে! তিনি ত কোন দিনও এদিকে বেড়াইতে আসেন না!

প্রজাগণ সন্ত্রস্ত এবং রাজসভা মন্ত্রণা ও আলোচনার বাক্যজালে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রহমৎ যথাসময়ে নিয়মিতভাবে দরবারে আসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়াছিল। সর্দ্দার ইদানীং তাহাকে অন্যতম সেনানী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সর্দ্দারের আগমনে সভাস্থল সহসা নিস্তব্ধ হইল। সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মোয়াজেম খাঁ একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া—ললাট রেখাঙ্কিত।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া সর্দ্দার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আজ আমার রাজ্য বিপন্ন। সকলেই শুনে থাক্‌বেন, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু সর্দ্দার জিন্দা খাঁ সীমান্তপ্রদেশের ৬।৭খানা গ্রাম অধিকার করে রাজধানী আক্রমণের উদ্যোগ কর্‌ছে। তার আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য সেনাপতি রেজা খাঁ হাজার সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। সেনাপতি আহত, সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। এই দুরন্ত দস্যুদলকে পরাজিত না কর্‌তে পারলে রাজ্যের সর্ব্বনাশ হবে। আমি একজন সাহসী ও চতুর সেনানায়ককে এই কাজের ভার দিতে চাই। কিন্তু বেশী সৈন্য আমি দিতে পারব না। দেশের চারিদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেনাদলকে ছড়িয়ে রাখ্‌তে হবে—রাজধানী রক্ষার জন্যও প্রচুর সৈনিক প্রয়োজন। আপনাদের মধ্যে কে অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দস্যুর বিরুদ্ধে যেতে চান?"

দস্যু সর্দ্দার জিন্দা খাঁর নাম সকলেই জানিত। এই প্রবল পরাক্রান্ত দস্যুর নামে সমগ্র আরবদেশ কম্পিত হইত। এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সেনাপতি রেজাখাঁর ন্যায় অমিততেজা ও রণকুশল সেনানায়কও যখন যুদ্ধে পরাজিত ও আহত, তখন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কে ধ্রুব মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে?

সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা প্রচণ্ড নীরবতার যবনিকা কে যেন প্রসৃত করিয়া দিয়াছিল।

সর্দ্দার জানিত, জিন্দা খাঁর নাম শুনিলে কেহই সাহস করিয়া তাহার বিরুদ্ধে স্বল্প সেনাবলসহ অভিযান করিতে চাহিবে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সীমান্ত প্রদেশে অধিক সৈন্য প্রেরণ করিবার সাহসও তাঁহার ছিলনা।

মোয়াজিম খাঁ কণ্ঠস্বর উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "আজ এই দুশ্চিন্তার দায় হইতে আমাকে যে মুক্তি দিতে পারবে—এই পাপিষ্ঠ দস্যুকে পরাজিত করতে পারবে, তাকে আমি বিশেষ পুরস্কার দান করব—সে যা চাইবে, যদি আমার সাধ্যাতীত না হয়, তাই তাকে দেব।"

সেনাপতি ফৈজু দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "বিশসহস্র সৈন্য হইলে আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি, জাঁহাপনা।"

"অসম্ভব! এত অধিক সৈন্য এ সময়ে দেবার শক্তি আমার নাই। দশহাজার তুমি পাইতে পার।"

সেনাপতি আসন গ্রহণ করিলেন।

সভামধ্যে একটা গুঞ্জন শব্দ উত্থিত হইল; কিন্তু কোনও উৎসাহী বীরকে সর্দ্দারের সম্মুখে আর উত্থিত হইতে দেখা গেলনা।

মোয়াজিম খাঁ নৈরাশ্য ভরে বলিয়া উঠিলেন, "কি দুর্ভাগ্য! ইরাক্ কি আজ বীর শূন্য?"

সভার প্রান্তদেশ হইতে গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল," নিশ্চয় নহে। আপনি আদেশ করুন, জাঁহাপনা! আমি ৫ হাজার সৈন্য নিয়ে জিন্দা-খাঁকে আরবের মরুভূমি পার করে দিয়ে আসি।"

দরবার গৃহস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বিস্মিত দৃষ্টি সেইদিকে নিক্ষিপ্ত হইল।

তাহার মৃত্যু সংবাদে তাহারা উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

সর্দ্দার, রহমতের উল্লিখিত বীরত্ব ও রণকৌশলের পরিচয় পাইয়া রাজধানীতে উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শত্রু দমন করিয়া রহমৎ যখন দরবার গৃহে প্রবেশ করিল, সর্দ্দারের আদেশে বীর যুবককে পুষ্পমাল্যে অভিনন্দিত করা হইল। রহমতের জয়ধ্বনিতে দরবার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সর্দ্দার তখন স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন, "রহমৎ, তুমি দেশের ইজ্জৎ,, শান্তি রক্ষা করেছ, শত্রুভয় থেকে প্রজাগণকে চিরমুক্তি দিয়েছ। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। কি পুরস্কার চাও বল।"

রহমৎ নীরবে, নত নেত্রে বসিয়া রহিল। প্রচুর রাজৈশ্বর্য্য, প্রভূত সম্মান, কিছুই সে চাহেনা। সে শুধু তাহার আশৈশবের ক্রীড়া সঙ্গিনীকে জীবনসঙ্গিনী করিতে চাহে। ইহা হয়ত তাহার পক্ষে দুরাশা, কিন্তু সেই আশার বলেই সে অসাধ্য সাধন করিতে গিয়াছিল। রাবেয়ার প্রতি তাহার একনিষ্ঠ প্রেমই তাহার বক্ষে ও বাহুতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, নহিলে জিন্দাখাঁর কাছে সে শিশু মাত্র।

"বল, রহমৎ, তুমি কি চাও? আমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ—"

বাধা দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রহমৎ বলিল, "বান্দাকে অত লোভী মনে করবেন্ না, জাহাপনা। অর্থ বা ভূসম্পত্তির প্রতি অধমের কোন আকর্ষণ নেই।"

বিস্মিত নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সর্দ্দার বলিলেন, "তবে কি চাও তুমি বল?"

জিন্দাখাঁর সহিত যুদ্ধে যাহার বক্ষ স্পন্দিত হয় নাই আজ তাহার হৃদয় ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে অবশেষে সে তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিল।

দীপ্তরোষে মোয়াজ্জেম খাঁ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কুকুর, তোর এতবড় স্পর্দ্ধা!—বিদ্রোহীটাকে যাবজ্জীবন দ্বীপে বন্ধ করে রাখবার হুকুম দিলাম। আমার উপকার করেছে বলে প্রাণ দণ্ড দেওয়া হলনা। প্রহরী একে নিয়ে যাও।"

সেনাপতির আদেশে রহমৎ তাহার কোষবদ্ধ তরবারী নীরবে সর্দ্দারের চরণতলে খুলিয়া রাখিল। নীরবে প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া সে নির্ম্মম দণ্ডভোগ করিতে চলিল। রাবেয়া যখন চিরজন্মের মত তাহার কাছে দুর্লভ, তখন কারাগারের বন্ধনই তাহার কাছে শ্রেয়ঃ।

উন্নতশীর্ষে রহমৎ ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

( ৫ )

সীমাহীন জলবিস্তার—দূরে একদিকে শুধু ইরাক সর্দ্দারের শুভ্র প্রাসাদ ক্ষুদ্র খেলাগৃহের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। বৃক্ষলতাহীন, শুষ্ক, গাঢ় কৃষ্ণ-বর্ণ দ্বীপটি যেন জলমগ্ন দৈত্যের ন্যায় মাথা খাড়া করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া আছে। উহার গর্ভে একটি গুহামধ্যে অনুরূপ কৃষ্ণবর্ণে একমাত্র অধিবাসী রহমৎ, সেই প্রাসাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

অপরাহ্ণের আলো ক্রমে দিকে দিকে ম্লানরেখা টানিয়া দিয়া পশ্চিম সমুদ্রবেলায় ঢলিয়া পড়িতেছিল। বৈশাখের আকাশপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ দূর হইতে একটি বিন্দুর মত দেখা যাইতেছিল, বায়ু স্তব্ধপ্রায়, জলবিস্তার নিস্তরঙ্গ—প্রকৃতি যেন রূঢ় বেদনায় গুমরিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

গুহামধ্যে বন্দী শৃঙ্খলিত নহে, মুক্ত। হিংস্র জলজন্তু-সমাকীর্ণ সে জলবিস্তার অতিক্রম করিয়া কোনও ব্যক্তি পলায়ন করিতে সমর্থ নহে মনে করিয়াই ইরাকের অধিপতি রহমৎকে গুহামধ্যে মুক্ত অবস্থায়

না, সে ঐ প্রাসাদে—যেখানে তাহার শৈশবসঙ্গিনী, জীবনের একমাত্র আরাধ্যা দেবী বাস করিতেছে, সেই প্রাসাদপানে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া এই নির্ব্বাসিত জীবন পাত করিবে, কোথাও যাইবার—পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিবার তাহার কোন সাধ নাই। ইরাকের বাতাস রাবেয়ার দেহসুরভি বহন করিয়া পবিত্র, যে প্রাসাদে সে বাস করিতেছে. তাহার পাদমূল চুম্বন করিয়া তরঙ্গরাশি এই শৈলমূলে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে, ইহাদের মধ্য দিয়াই সে রাবেয়ার রূপ, গন্ধ, স্পর্শের রস কি অনুভব করিতে পারিতেছে না? না, এখানেই তাহার চির-নির্ব্বাসিত জীবন শেষ হইয়া যাউক।

কিন্তু আজ রক্ষিগণের মুখে সে যে সংবাদ শুনিয়াছে তাহাতে, এতদিন সে যে আশ্বাসে বাঁচিয়াছিল, তাহাও ত চূর্ণ হইয়া গেল! সর্দ্দার-নন্দিনীর আজ বিবাহ—পারস্যের উপকূলবর্ত্তী কোনও জনপদের রাজকুমার চিরদিনের জন্য রাবেয়াকে জীবনসঙ্গিনী করিতে আসিয়াছে। আজ রজনীতে রাজধানী উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠিবে। কাল প্রভাতে রাবেয়া সুন্দরী স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে—তখন প্রাণহীন আশাশূন্য আনন্দ-বঞ্চিত এই ইরাকে রহমতের অবস্থিতির সার্থকতা কোথায়?

যুবক স্থির দৃষ্টিতে তটাভিমুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার বলিষ্ঠ বাহুযুগল ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল, বিশাল বক্ষোদেশ আন্দোলিত হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত বেদনাকে প্রকাশ করিতেছিল।

ঘনান্ধকারে জল ও স্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল! রহমৎ দেখিল, তীরভূমি আলোক-রেখায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয় প্রাসাদ ও রাজধানী আজ মহানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। রহমৎ! রহমৎ! আজ তোমার ইহলোকের সকল সাধ, সব আনন্দের সমাধি!

আরোহণী সুবিন্যস্ত হয় নাই, উহার উপর দাঁড়াইবা মাত্র সহসা উহা একপার্শ্বে সরিয়া গেল।

সুন্দরীর মুখ হইতে একটা অব্যক্ত বিস্ময় ও আতঙ্কের চাপা শব্দ হইবামাত্র সঙ্গিনীরা চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল।...না, রাজকুমারীর অঙ্গে কোনও বিশেষ আঘাত লাগে নাই; কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, একটা অর্দ্ধনগ্ন মৃতদেহ বজরা ও সোপানশ্রেণীর মধ্যে ভাসিতেছে। রাজকুমারীর কোমল চরণযুগল শবদেহ স্পর্শ করিয়াছিল।

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া রাবেয়া উপরের সোপানের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মৃত দেহটা কোথা হইতে আসিল? গোলমাল শুনিয়া মোয়াজেম খাঁ ঘটনাস্থলে আসিলেন। তাঁহার আদেশে মৃতদেহ তীরে তোলা হইল।

বৃদ্ধা ধাত্রী রহমতের জননীও রাবেয়ার সঙ্গে আসিয়াছিল। সেও ব্যাপার দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। মোয়াজেম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই বিবর্ণ, বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ধাত্রী দুইহস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ হইতে চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মর্ম্মভেদী স্বরে বাহির হইল—"বাপজান!"

মিলন রজনীর প্রভাতে শৈশব সঙ্গীর প্রাণহীন দেহস্পর্শে রাবেয়ার সুন্দর গোলাপী আননে কি মৃত্যুর বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ছোট্ট একটি ঘরে একলা থাক্‌তো। জান্‌লা দিয়ে সীমাহীন অনন্ত আকাশ তা'র চোখে পড়্‌তো ও মনে নানা ভাব জাগিয়ে তুল্‌তো। জ্যোৎস্না রাতে জান্‌লা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে প্রেয়সীর মতো তাকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌তো। বর্ষা রাতে কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতবালার নৃত্য চ্যুত স্বর্ণ মেখলার অপূর্ব্ব জৌলুষ তা'কে বিস্ময়-মুগ্ধ ক'রে তুল্‌তো। বর্ষা ধারা নিশীথ রাত্রে যখন চিরন্তন বিরহ বেদনার ক্রন্দন গীত গাইতো. সে তখন ব'সে ব'সে নিজের মানসীর কাল্পনিক বিরহের কবিতা লিখ্‌তো। এমনি ক'রেই ভাব-খেয়ালে মশ্‌গুল হ'য়ে তার দিন কাট্‌ছিলো।

সে অবিবাহিত। বিয়ে কর্‌লে হয়তো কর্‌তে পার্‌তো কিন্তু বিবাহ যে নিছক সামাজিক বা লোকাচার ঘটিত ব্যাপার নয়, সেটার মধ্যে দিয়ে যে একটা চিরন্তনী প্রেমের ধারা ব'য়ে আস্‌ছে, তার ভিতর রোমান্স ভরা এবং প্রেম ও রোমান্স না থাক্‌লে যে, বিবাহ বিবাহই নয়. এই ধারণা তা'র বদ্ধমূল ছিলো ব'লে সে এতোদিন বিয়ে করেনি। তা'র মানসীকেই প্রেম, বিরহ, মিলন দিয়ে অভিনন্দিত কর্‌তো।

একদিন তা'র বন্ধু ভূতনাথ তা'কে খ্যাপাবার জন্যে বল্‌লে—হ্যাঁরে. এতো লিখ্‌ছিস্ কই কোনো মানসী তো তোর মূর্ত্তিমতী হ'য়ে তোকে ধরা দিলে না। তোর লেখা প'ড়ে কোনো মানসী কিছু জবাব পাঠিয়েছে ?

এই কথায় কুমুদের মনে ধাক্কা লাগ্‌লো। সত্যই তো এতো দিন এ সম্বন্ধে তা'র মনে তো কিছুই হয়নি। এতো লেখা সব বৃথা হ'য়েছে। হয়তো এই লেখার ফাঁদেই মানসী ধরা পড়্‌তো। মনটা মুশড়ে গেলো. হতাশ ভাবে উত্তর কর্‌লে—কই, কেউতো কিছু লেখেনি, আর আমি ঠিকানা কাউকে জানাই নি, কাজেই কোনো জবাব পাইনি। মনে ধিক্কার এলো—সে মানসীকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

আর এক বন্ধু প্রবোধ তা'কে হতাশ ক'রে দিয়ে বল্‌লে—আরে ছ্যা, আসল জিনিষেই ভুল। লেখার আসল উদ্দেশ্য যা তাই তুই অবহেলা করেছিস্। আর মানসী মানসী ক'রে হাওয়া হাতড়ে বেড়াচ্ছিস্। তুই একটা প্রকাণ্ড গাধা। আরে মানসী কাল্পনিক হ'লেও তা'কে চেষ্টায় বাস্তব ও সজীব ক'রে তুল্‌তে হবে। তবেই তো আসল রোমান্স।

কুমুদের মনে হ'লো সত্যই তো। মানসী তো আর আপনি মূর্ত্তি ধ'রে আসে না এবং কোনো কবিকেই সে নিজে দেখা দেয়নি যতক্ষণ না তা'রা চেষ্টা ক'রে কল্পনার সোণার কাঠির স্পর্শে সজীব করে তুলেছে। আর এই সজীব করার জন্যে চাই প্রাণপাত সাধনা ও চেষ্টা।

সেইদিন হ'তে কুমুদ তার প্রাণের সমস্ত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে, সঞ্চিত বিরহকে, ছন্দে বেঁধে দিকে দিকে মানসপ্রেয়সীর উদ্দেশে পাঠিয়ে দিতে লাগ্‌লো। নানা উপায়ে ও কৌশলে গল্পের ভিতর নিজের ঠিকানা চালাতে লাগ্‌লো। আর সেই দিন হ'তে উৎসুক হ'য়ে ডাকের প্রত্যাশায় ব'সে থাক্‌তে লাগ্‌লো। মনে আশা, আজ নিশ্চয় কোনো না কোনো উত্তর আস্‌বে,—কোনো মানসী চিঠির বুকে তা'র বিরহ-বেদনা জানাবে।

কিন্তু প্রতিদিন নিরাশার মধ্যে দিয়ে কাটলেও মনে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে ছিলো যে, একদিন না একদিন সে মানসীর লিপি পাবে।

সেদিন সকালে সে ঘরে ব'সে লিখছে, এমন সময় ভূতনাথ ও প্রবোধ এসে তা'র সাম্‌নে একখানা মাসিক পত্র ফেলে দিয়ে বল্‌লে এই দেখ্, প্রভাতী তোর বিরহ বেদনার সান্ত্বনালিপি বুকে ক'রে এসেছে। লেখিকা—চিত্র সেনা।

কুমুদ আশা-কম্পান্বিত বুকে একদমে সমস্ত লেখাটা প'ড়ে গেলো।

এই ছোট্ট চিঠিখানির ভিতর কুমুদ চিত্রসেনার হৃদয়ের অনেকখানিই যেনো দেখতে পেলে। স্পষ্টই বুঝতে পার্‌লে চিত্রসেনাও তার প্রতি অনুরাগিনী,নইলে এমন উপযাচিকা হ'য়ে পত্র লেখে! আজ তা-রী আনন্দ হ'লো তার। যে অজানা মানসীকে এতদিন হৃদয়ের সমস্ত প্রেম উদ্দেশে অঞ্জলি দিয়ে এসেছে, আজ সেই মানসী মূর্ত্তিমতী হ'য়ে তা'র অঞ্জলি গ্রহণ কর্‌তে এসেছে। কয়জন লেখকের ভাগ্যে এতোটা গৌরব হয়! তার সমকর্ম্মীরা দেখুক। তা'রা দেখুক যে, সে শুধু লেখক নয়, প্রেমিক, সাধক—প্রেমকে সজীব ক'রে মূর্ত্তি দিতে পারে।

কুমুদের চিঠি পেয়ে এক ভাবনা হ'লো যে, চিঠিতে তো চিত্রসেনা ঠিকানা দেয়নি, অথচ সে কুমুদের উত্তরের অপেক্ষায় থাক্‌বে। সে কেমন করে উত্তর দেবে। নিশ্চয় চিত্রসেনা ভুল করেছে। কিন্তু এ ভুল যে কি মারাত্মক তা' বুঝলে সে নিশ্চয় করতো না। এবার যা থাকে কপালে প্রভাতী আপিস থেকে ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে আসবে। তারা যাই মনে করুক সে ঠিকানা আন্‌বে—মানস লক্ষ্মীকে কাছে পেয়ে লজ্জার জলে বিসর্জ্জন দিতে পার্‌বেনা, তা'কে পূজা করবে। সে চিঠি লিখে ঠিকানা আন্‌বে মতলব করে চিঠি লিখতে ব'সে গেলো।

আজ কুমুদের প্রেমের আবেগ পরিপূর্ণ জোয়ারের মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। চিঠির বুকে তা'র হৃদয়ের এতো দিনের সঞ্চিত প্রেমকে মুক্ত ক'রে দিলে। প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে চিঠিখানিকে সজীব ক'রে তুল্‌লে। দিনের পর দিন তার প্রেমাতুর হৃদয়ের মধ্যে যে বিরহ বেদনা সঞ্চিত হ'য়েছিলো, সেই বেদনা আজ পাওয়ার আনন্দে মুহূর্ত্তের মধ্যে উপশম হ'য়ে গেলো।

চিঠি লেখা শেষ হ'লে কুমুদের মনে আবার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'লো যে, প্রভাতী আপিসে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করবে কি না। কিছু ঠিক কর্‌তে না

তারপর চিঠির বুকে রয়েছে একটু অনুযোগ। কেনো কুমুদ চিঠির উত্তর দেয়নি। লেখা আছে,—চাতকের জল চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে লোকে নিজের মনের আকাঙ্ক্ষার তুলনা করে। কিন্তু জানিনা চাতকের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কতো প্রবল। আমার মনে হয় আমি যে ভাবে আপনার চিঠির অপেক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হৃদয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছি তা'র কাছে চাতকের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নয়। আশা করি এবার আর শুধু নিরাশা নিয়ে দিন কাটাবো না।

চিঠি প'ড়ে কুমুদ ঠিক কর্‌লে এবার চিঠি দিতেই হবে, না দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। কিন্তু এ চিঠিতেও যে ঠিক সেই ভুল!—ঠিকানা নেই! হায় অভিমানিনী! তোমার সামান্য একটু ভুলের জন্য তুমিও তোমার আকাঙ্ক্ষায় নিরাশ হৃদয়ে দিন কাটাচ্ছো, আর আমার অবস্থাতো অবর্ণনীয়। এবার আর নয়, প্রভাতী আপিস থেকে ঠিকানা আন্‌বে। তবে নিজে যাবার আগে একবার ভূতনাথ কি প্রবোধকে ব'লে দেখ বে যদি তারা এনে দিতে পারে। কারণ সে নিজে গেলে সকলে সন্দেহ কর্‌বে। প্রভাতী আপিসে সকলেই তা'কে চেনে।

চিঠি লেখা শেষ করে ভাব্‌তে লাগলো কি ক'রে ঠিকানার কথা পাড়্‌বে। ব'সে ব'সে যখন কুমুদ ভাবছে এমনি সময় তা'র বন্ধুদ্বয় নিজেরাই এসে উপস্থিত। কুমুদ যেনো একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লো এবং একটু আনন্দিতও হলো। এ-কথা সে-কথার পর সে সব সঙ্কোচ দমন ক'রে ফট্‌ ক'রে ব'লে ফেল্‌লে—হ্যাঁ হে, তোমরা আমার একটু উপকার কর্‌তে পারো?

বন্ধুরা ব্যাপার বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

কুমুদ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লে—যদি দয়া ক'রে প্রভাতী আপিস থেকে আমায় চিত্রসেনার ঠিকানা এনে দাও।

প্রবোধ কুমুদের কথা শুনে হেসে বল্‌লে—এর জন্যে এতো গৌর-চন্দ্রিকা গাওয়া হচ্ছিলো কেনো ? সোজা কথায় বল্‌লেইতো চল্‌তো।

ভূতনাথ জোর দিয়ে বল্‌লে—আল্‌বৎ এনে দেবো। তোর মানসীর ঠিকানা এনে দেবো না !—এতে ভণিতার অবতারণা কর্‌ছিলি কেনো ?

কুমুদ একটা মহা সমস্যার হাত হ'তে উদ্ধার পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বন্ধুদের কাছে হৃদয় উদ্‌ঘাটন ক'রে চিত্রসেনার সব কথা ব'লে গেলো। বন্ধুরা তাকে ঠিকানা এনে দেবে আশ্বাস দিয়ে চ'লে গেলো।

তার পর দিনই ঠিকানা এসে হাজির হ'লো। কুমুদ সেই দিন থেকে নিত্য নব নব অনুরাগে চিত্রসেনাকে পত্র দিতে লাগ্‌লো। কিন্তু ক্রমে এও যেনো পুরোণ হ'য়ে গেলো। দেখা ক'রে মানসীর পূজা কর্‌বার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্‌লো অথচ লজ্জার খাতিরে নিজে দেখা কর্‌বার প্রস্তাব কর্‌তেও কুণ্ঠা বোধ কর্‌তে লাগলো।

মানুষের স্বভাবই এই যে, দৃষ্টি যেখানে বাধা পায়, সেইখানে তা'র অপর পারে কি আছে দেখবার জন্যে সে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। সামনের দৃশ্য তখন আর তা'কে মোহিত কর্‌তে পারে না।

কুমুদের অবস্থাও তাই। চিঠির ভিতর তৃপ্তি না পেয়ে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো সে।

ভগবান যেনো কুমুদের এই আন্তরিক বাসনা কাণে শুন্‌লেন। একখানি চিঠি এলো। চিঠিখানি কিন্তু পোষ্টাপিসের কর্ত্তাদের কৃপায় নানা পোষ্টাপিস ঘুরে, ঘোরার চিহ্ন নানা পোষ্টাপিসের ছাপ সর্ব্বাঙ্গে নিয়ে, তিলকধারী বৈষ্ণবের মতো চারদিন পরে এসে উপস্থিত।

কুমুদ উৎসুক আতঙ্কে চিঠিখানি খুল্‌লে। বেশী কিছু লেখা

পথ হাতড়ে বাড়ীর দরজার কাছে পৌঁছলো। দরজার পাশের যে-ঘর থেকে আলো আস্‌ছিলো সেই ঘরে উঁকি মেরে দেখলে একজন চাকর একটা বটতলার চোথা কাগজে ছাপা রামায়ণ পড়ছে। কুমুদ সাহসে ভর ক'রে তা'কে আস্তে আস্তে ডাক্‌লে।

চাকরটা বেরিয়ে আস্‌তেই কুমুদ তাকে কোনো কথা বলবার আগেই তা'র হাতে একটা টাকা আনন্দের আতিশয্যে গুঁজে দিলে। চাকরটা ব্যাপার বুঝতে না পেরে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কুমুদ পরে তা'কে প্রশ্ন ক'রে জেনে নিলে, বাড়ীতে পুরুষ কেউ থাকে না, মেম সাহেব একলা থাকেন ও ইস্কুলে কাজ করেন। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করায় তাঁর আপত্তি নেই। এই সব খবরে আশ্বস্ত হ'য়ে মেম সাহেবকে দেখা করবার এৎত্তালা পাঠিয়ে দিলে কুমুদ। বেহারা তা'কে একটা ক্ষীণ আলোকিত ঘরে বসিয়ে ভিতরে চলে গেলো।

কুমুদ বাড়ীর ভিতরের রাস্তার দিকে মুখ ক'রে বসলো। পাছে, পিছন ফিরে বস্‌লে ত'ার প্রেয়সী অলক্ষ্যে এসে তাকে অপ্রস্তুত ক'রে দেয়। দরজায় একটা পর্দ্দা টাঙ্গিয়ে ভিতর ও বাহিরের ব্যবধান রক্ষা করা হয়েছে।

কুমুদ প্রতীক্ষায় ব'সে ব'সে ভাবতে লাগ্‌লো, কি ব'লে কথা আরম্ভ কর্‌বে। কি ব'লে বিলম্বের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বে। ভেবে কিছুই ঠিক কর্‌তে না পেরে মানসীর রূপ কল্পনায় খস্‌ড়া কর্‌তে লাগলো।—অনেক কিছু কল্পনা করার পর ঠিক কর্‌লে সে তন্বী, রং উজ্জ্বল না হলেও মাজা। মাথার চুল নিশ্চয়ই এলোনো। পরণে তার নিশ্চয়...। তা'র ভাবনা ভাঙ্গিয়ে গুরু পদক্ষেপ কাণে এলো। সে চম্‌কে উঠলো। এতো তন্বীর লঘু পদক্ষেপ নয়। বিস্ময় বাড়িয়ে

# গর্ব্বী।

নাহি জানি লঘু কিম্বা গুরুজন আমি
আত্মীয় কি অনাত্মীয়, ঘৃণিত কি প্রিয় দিবাযামী
ধরার মাঝার
অযোগ্য বা নয়নের আনন্দ তোমার
একান্ত আপন না সে সব চেয়ে পর
বুকের মাণিক কিম্বা ব্যথার নির্ঝর।

বুঝিনাকো—চাহিনাকো বুঝিতে সে কথা
আমি শুধু প্রিয়তমে মরমের জানি এ বারতা
জীবনে মরণে
হৃদয়ের প্রেম মোর তোমারি চরণে
সুখে দুঃখে চিরদিন রবে অচঞ্চল
কণ্ঠের মালিকা হবে তোমারি অঞ্চল।

আজি মোরে রাখিয়াছ প্রাণ হ'তে তব
নিয়ত যে দূরে ঠেলি, ভেবেছ কি নীরবে তা সব?
লেখনী আমার
রচিবেনা ছন্দে তার তীব্র তিরস্কার?
বেদনায় নিপীড়িত তারি তপ্ত ভাষ
শাস্তি তব অহরহ করিবেনা গ্রাস?

তাহারে নিবারে কিসে ? তুমি মোর নহ
চুপ্, চুপ্—হেন বাণী মুখে নাহি লহ।

যদি না মরিয়া থাকে বৃদ্ধ ভগবান
বধির হইয়া নাহি গিয়ে থাকে দুটি তার কান
এই পাপ কথা
পশিলে শ্রবণে তার, বিহীন মমতা
তোমারে সে দিবে যেই নিদারুণ ফল
স্মরি তাহা, হৃদি মোর শিহরে কেবল।

আমার প্রেমের শাস্ত্র মানেনা ভুবনে
কেবা নিঃস্ব, কেবা ধনী—ছোটো বড়, লঘু গুরুজনে
আমি শুধু জানি
এ অধরে ও অধর মিলাইয়ো আনি
দুইজনে রহি যদি দুজনের আশী
তুমি যদি ভালোবাসো, আমি ভালোবাসি।

আমি যদি গুরুজন, দূরে দূরে থেকো
আমি যদি লঘু তবে নিশিদিন তফাতেই রেখো
অধর, কপোল
যাউক্ নিপাত তব, করিবনা গোল
চাহিনা দরশ তবে, চাহিনা পরশ
দেখা দিয়ে বাড়ায়োনা আমার অযশ।

# চক্র

জীর্ণ একতলা বাড়ীর একটি কক্ষে মাতা উদ্বিগ্ন মুখে রুগ্ন পুত্রের শয্যা পার্শ্বে বসিয়াছিল। ঔষধ ও পথ্য এ বেলায় কোন রকমে চলিতে পারে, তাহার স্বামী যদি আজও রিক্ত হস্তে ফেরেন, তাহা হইলে কি উপায়ে যে ঔষধ পথ্য সংগ্রহ হইবে তাহাই ভাবিয়া জননী ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় দ্বারের বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। কোন প্রতিবেশিনীর পদধূলি ত আজ পর্য্যন্ত তাহার গৃহে পড়ে নাই; কেনই বা পড়িবে? এই অপরিচিতাকে আসুন বলিয়া সম্বোধন করিতেও সে সাহস করিল না, সে শুধু সকরুণ নিষ্পলক দৃষ্টি অপরিচিতার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

লীলা বিনা সম্ভাষণে বেশ সপ্রতিভ ভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যার নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া রুগ্ন শিশুটির মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া জননীর দিকে ফিরিয়া স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ ভাই, এটী বুঝি তোমার ছেলে; কি অসুখ হয়েছে ভাই?

উষার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বাষ্পারুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ দিদি, এটী আমারই ছেলে—আজ বার দিন জ্বরে বেহুস হ'য়ে পড়ে আছে।

লীলা মনে করিল, পুত্রের পীড়ার জন্য আশঙ্কায় জননী এমন করিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যে সে কহিল, ভয় কি ভাই,

জ্বর হয়েছে সেরে যাবে। বারদিন হ'য়েছে, চোদ্দ দিনের দিন জ্বর ছেড়ে যাবে।

উষা চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, ডাক্তার বাবুও তাই বলে' গিয়েছেন। ছেলে নিয়ে একলা বসে থাকতে আমার বড্ড ভয় করে।

লীলা সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, তা' তো করবেই ভাই, তোমার স্বামী বুঝি আপিসে চাকরী করেন? ছুটী পান না?

উষা ইহার কি উত্তর দিবে; সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া লীলা বলিল, তোমার বুঝি এখনো নাওয়া খাওয়া হয়নি? ছেলে ছেড়ে কি করেই বা যাবে! আমি বস্‌ছি, তুমি নেয়ে খেয়ে এস ভাই।

উষার দুই চোখে আবার অশ্রু উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। আজ দুই দিন তাহার পেটে অন্ন পড়ে নাই, তাহার স্বামী যাহা কিছু আনিয়াছে সে সমস্তই পীড়িত পুত্রের ঔষধ ও পথ্যে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে সে কথা সে জানিতে দেয় নাই, জানিলে সে নিশ্চয়ই যে কোন উপায়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিত। পুত্রের জন্য সে সব করিতে পারে, কিন্তু নিজের পেটের জন্য—না না সে কিছুতেই পারে না। শুধু জল খাইয়া সে তো বেশ আছে, কই এমন কি কষ্ট তাহার হইতেছে! এই অপরিচিতা নারীর কাছে কথাটাও সে কিছুতেই যে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। তাই প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্যে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া সে কহিল, আমি খেয়েছি দিদি, রাত জাগতে হয় কিনা, তাই এমন দেখাচ্ছে।

লীলা কথাটা অবিশ্বাস করিতে পারিল না, সে মনে করিল স্বামীকে পুত্রের কাছে বসাইয়া সে সকাল সকাল খাইয়া লইয়াছে। সে বলিল, তা হ'লে তুমি একটু গড়িয়ে নাও ভাই, আমি খোকার কাছে

বস্‌ছি ; তোমায় তো আবার রাত জাগতে হবে।

উষা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি অদ্ভুত স্নেহময়ী এই অপরিচিতা নারী ! পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, ইনি নিশ্চয়ই নবাগতা, তাহাদের প্রকৃত পরিচয় জানেন না ; জানিলে কখনও তিনি এ গৃহে পদার্পণ করিতেন না, তাহাদের দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইতেন ; স্নেহের কণা মাত্র তাহার অন্তরে স্থান পাইত না। কিন্তু কি অপরাধে তাহাদের আজ এই দুর্দ্দশা ? সে যদি সত্যই পতিতার কন্যা হয়, সে নিজে ত পতিতা নয়, তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার স্বামী ত মহানুভবতারই পরিচয় দিয়াছেন, অথচ তজ্জন্য তাহাদের এই নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে। সমাজের এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্যে তাহার স্বামী আজ অমানুষ ; লোক চক্ষে ঘৃণ্য। সমাজের ত কিছুই হইল না, ফলে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা তাহাদের চির-সাথী হইয়াছে। এখন ত' বাহিরের লোককে কোন দোষ দেওয়া যায় না।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া লীলা আবার বলিল, বসে রইলে কেন ভাই, শোও ; রোগের সেবা করা আমার অভ্যাস আছে।

উষা আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না, কম্পিত কণ্ঠে কহিল, দিদি, তোমায় এ দয়া আমি জীবনে ভুল্‌তে পারবো না, আমাদের কেউ দয়া করে না, আমাদের দিকে কেউ ফিরেও চায় না সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয়—তুমিও তাই কর দিদি, তুমিও তাই কর।

লীলা ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিল, তোমাদের সঙ্গে পাড়ার লোকেদের বুঝি ঝগড়া ভাই ? আমি মাসীমাকে বল্‌বো তিনি সব মিটিয়ে দেবেন।

উষা কি বলিতে যাইতেছিল এমনি সময় খোকা কাঁদিয়া উঠিল ; সে তাহার মুখের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গভীর স্নেহে তাহার মাথায়

মধ্যে ঢুকে একেবারে চুপ হয়ে যায়; বৌটাকে বোধ হয় খুব ভালবাসে, বৌটাও খুব সেবা যত্ন করে'। তবু মাসের মধ্যে আদ্ধেকদিন বৌটা খেতেই পায় না! প্রায়ই তো উনুনে আগুন পড়ে না, কি খায় সেই জানে, অথচ লোকটা এসে যখন জিজ্ঞেস করে, তখন বলে, হ্যাঁ। খেয়েছি। কিন্তু মুখ দেখলে তা' তো মনে হয় না।

উষার শুষ্ক মুখখানি লীলার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ব্যথিত কণ্ঠে সে কহিল, আজ তার মুখখানা কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখলাম; নিশ্চয়ই কিছু খায়নি। আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, খাওয়া হয়েছে দিদি; বল্‌লে, হ্যা। বোধ হয় মিথ্যে কথা বল্‌লে!

মামীমা বলিলেন, উপোস করা ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে।

উষা তাহার মামীমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

পরদিন মধ্যাহ্নে মাসিমাতার অজ্ঞাতসারে লীলা আবার উষার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। পরমানন্দ গৃহে ছিলনা; উষা রুগ্ন শিশুর পার্শ্বে শুইয়াছিল। সকাল হইতে শিশুর পেটে এক ফোঁটা ঔষধ পড়ে নাই; তাহার স্বামী অর্থের জন্য বাহির হইয়াছে, হয় তো কি একটা কাণ্ড করিয়া ফিরিবে—ইহাই ভাবিয়া উষা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীকেই বা সে কি দোষ দিবে—সে তো বাপ; বাপ হইয়া কেমন করিয়া সে বিনা ঔষধ পথ্যে চোখের উপর পুত্রকে মরিতে দেখিবে। অর্থতো চাই, যে উপায়েই হউক্। ভগবান! ভগবান!

এমন সময় দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া লীলা ডাকিল, দিদি!

উষা ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। সে নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না! আর তো এই নারীর কাছে তাহার প্রকৃত পরিচয় গোপন নাই, জানিয়া শুনিয়া সে আবার আসিয়াছে!

লীলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, কাল তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বল্‌লে কেন ভাই ?

উষার বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এ মেয়েটী তাহা হইলে তাহাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছে।

লীলা বলিল, তুমি সত্যি করে' বলতো ভাই, কাল তুমি কিছু খেয়েছিলে কিনা ? নিশ্চয়ই কিছু খাওনি, আমি তোমার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি, তোমায় না খাইয়ে আমি কিছুতেই যাচ্ছিনা।

উষার সারাদেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে কম্পিত পদে শয্যা হইতে নামিয়া লীলার হাত চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দিদি. সত্যি খাইনি, কাল কেন আজ তিন দিন খাইনি ; তুমি বল না দিদি সকাল থেকে যার রুগ্ন সন্তানের পেটে এক ফোঁটা ওষুধ পড়েনি, তার গলা দিয়ে কিছু গলে ?

লীলার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে আঁচল হইতে একখানি দশটাকার নোট খুলিয়া লইয়া উষার হাতে দিয়া বলিল, খোকার ওষুধ আন্‌তে দাও দিদি।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে উষা ক্ষণকাল সেই নোটখানার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে লীলার পা জড়াইয়া ধরিল।

লীলা শশব্যস্তে পা সরাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, এ কি তোমার অন্যায় ভাই, তুমি আমার পায়ে হাত দাও ; আমি আর এখানে থাকব না। এই বলিয়া সে কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। উষা মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, তাহার চোখের জলে বক্ষ প্লাবিত হইয়া গেল।

সেদিন লীলার মাতুল-গৃহে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। তখন

সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, ঘরে ঘরে দীপ জলিয়া উঠিয়াছে। লীলার মাতুল বিপিনবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় "আমার মা কই, আমার মা কই ?" বলিতে বলিতে মত্তাবস্থায় পরমানন্দ কক্ষে প্রবেশ করিল। ইতি পূর্ব্বে কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে কি সুস্থ কি মত্ত কোন অবস্থাতেই সে প্রবেশ করে নাই। তাই বিপিন বাবু হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত, চমকিত ও ভীত হইয়া উঠিলেন।

পরমানন্দ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, সে কোন রকমে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া একখানি চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল, তারপর বিপিন বাবুর দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, বড়বাবু নমস্কার, আমার মা কই, মাকে আমি দেখতে এসেছি, পায়ের ধুলো নিতে এসেছি, পায়ের ধুলো—

বিপিনবাবু রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মাত্‌লামীর আর জায়গা পাওনি, যাও এখান থেকে। পরমানন্দ বলিল, মাতাল হয়েছি তা তো দেখতে পাচ্ছেন বড়বাবু, কিন্তু মাতলামী করি নি, মাকে দেখতে এসেছি বড়বাবু, পায়ের ধূলো নিতে এসেছি—পায়ের ধূলো ; মাতলামী করি নি।

বিপিনবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বেরিয়ে যা বেটা মাতাল কোথাকার, এতদিন রাস্তায় গোলমাল কর্‌তিস্ কিছু বলিনি বলে একেবারে বাড়ী চড়াও হয়েছ—বেরিয়ে যা বল্‌ছি এখনি, না হ'লে পুলিশে দেব।

পরমানন্দ আর কোন কথা না বলিয়া সহসা কম্পিত পদে বিপিন বাবুর দিকে অগ্রসর হইল। খান দুই চেয়ার বাধাস্বরূপ তাহার পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেগুলি ঠেলিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া

টানিতে রাস্তায় বাহির করিয়া দিল।

এই ঘটনার দিন দুই পরে লীলা পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। তারপর তিনমাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ঊষার পুত্র কোন রকমে বাঁচিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। ডাক্তার বায়ু-পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। এখানে থাকিলে ব্যাধির পুনরাক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা, পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পরমানন্দ এখন আর প্রত্যহ মদ খায় না, যদি বা দুই একদিন খায়—মাত্‌লামী করে না। পুত্রকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইতে হইলে যে টাকার প্রয়োজন সেই টাকার সন্ধানে সে ফিরিতে লাগিল। সেই কয়টা টাকা পাওয়াই তাহার একমাত্র কামনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময় একদিন আনন্দ-উদ্বেলিত অন্তরে গৃহে ফিরিয়া পরমানন্দ ঊষাকে বলিল, আর ভাবনা নেই, আজ রাত্রেই দু'শ টাকা পাব, আর দেরী ক'র না, কালই বেরিয়ে পড়ব।

ঊষা শঙ্কিত হইয়া বলিল, অত টাকা.....বাধা দিয়া পরমানন্দ বলিল, ভয় নেই ঊষা, ভগবান মিলিয়ে দিচ্ছে, চুরী কর্‌তে হবে না। তবুও ঊষার মনটা হাল্কা হইল না, সে বলিল, আমি সে কথা বলিনি, কোথায় টাকা পাচ্ছ তাই জান্‌তে চাইছিলাম।

পরমানন্দ বলিল, সে এক দাঁও জুটে গেছে ; এক জনের বাড়ী গিয়ে রাত্রে একবোতল মদ কিনে আন্‌তে হবে...ব্যস্! অমনিই দু'শ টাকা হাতে এসে যাবে। বলে দিয়েছি, আগাম একশ টাকা না দিলে কাজে হাত দিচ্ছি না।

ব্যাপারটা ঊষা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও সে আর কোন প্রশ্ন করিল না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের উপর মদ, আফিং

যথাসময়ে পরমানন্দ প্রাণ ভরিয়া মদ খাইয়া দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্তুত হইয়া বৃন্দাবনের সম্মুখে হাত পাতিয়া বলিল, টাকাটা দাও বাবা। বিনাবাক্যব্যয়ে বৃন্দাবন দশখানি নোট গুনিয়া তাহার হাতে দিল। পরমানন্দ একশ টাকা পকেটে রাখিয়া মহোল্লাসে নিরঞ্জনের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। কথা রহিল, কাজ শেষ করিয়া আসিতেই বাকী একশ টাকা তখনই তাহাকে দেওয়া হইবে। পরমানন্দের আহ্লাদ আজ দেখে কে! কালই সে সদ্য রোগ-মুক্ত পুত্রকে লইয়া বৈদ্যনাথ যাত্রা করিবে।

নিরঞ্জনের গৃহদ্বারে আসিয়া বার দুই ডাকিতেই নিরঞ্জন আসিয়া বাহিরের ঘরের দ্বার খুলিয়া দিল। পরমানন্দ সোজা তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, দরজাটা শিগ্‌গীর বন্ধ করে দিন মশাই। বিস্মিত নিরঞ্জন তাহার কথানুযায়ী দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরমানন্দ ততক্ষণে পুঁটলীটি তক্তাপোষের নীচে রাখিয়া দিয়াছে এবং টাকা ছয়টী বাহির করিয়া সবে তক্তাপোষের উপর রাখিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় "বাবা এতরাত্রে কে ডাক্‌ছিল?" বলিয়া একটী যুবতী সেই কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে পরমানন্দের সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল।

পরমানন্দ বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আমার মা যে, তুমি এখানে? লীলাও পরমানন্দকে চিনিল, বলিল, এই তো আমাদের বাড়ী, আর এই আমার বাবা, খোকা ভাল আছে?

পরমানন্দ আতঙ্কে বলিয়া উঠিল, কি বল্‌লে মা, নিরঞ্জন তোমার বাবা। মা! মা! বলিতে বলিতে হাতের টাকা কয়টী ঝনাৎ করিয়া

পকেটে ফেলিয়া, পুঁটলটি তক্তাপোষের নীচ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হাতে ঝুলাইয়া পরমানন্দ ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহাকে দেখিয়া বৃন্দাবনের দল জয়োল্লাসে সেইদিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। রক্তবর্ণ চোখে তাহাদের দিকে একবার চাহিয়া পরমানন্দ পুঁটলীটি ও কাগজে মোড়া বোতলটা রাস্তার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তারপর পকেট হইতে সেই ছয়টি টাকা ও নোটের তাড়াটি টানিয়া বাহির করিয়া হতবুদ্ধি বৃন্দাবনের দেহের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া পাগলের মত রাস্তার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।

বহুত বহুত কাজ রয়েছে মানুষ হবার দিকে,
জাগো বন্ধু ঠিক ক'রে নাও সৌখীন প্রাণটিকে !
রৌদ্র আছে ঝঞ্ঝা আছে আছে বিঘ্নবাধা ;
এই জীবনের পথের পরে মনটি রাখো সাদা !
বীরের মত চলো, চলো খাঁটি প্রাণের জোরে !
আজকে কবি গাইবে নাক' মিষ্টি ক'রে ক'রে।
এমনি ক'রে খুলে দিয়ে অনেকগুলি আঁখি
যেদিন আমার সামনে চলা থাক্‌বেনা আর বাকি,
সেদিন যদি এসো কাছে আজ এসেছ যারা,
সব অনুরোধ রাখবো সেদিন, কাজ হবে যে সারা !
যাবার বেলায় সেদিন আমি ঘুমিয়ে পড়ার ঘোরে
শেষ মিনতি রাখব তোমার, গাইব মিষ্টি ক'রে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

আমরা কাজের লোক—জ্যোৎস্না পান করে আর কবিতা লিখে তোমাদের মত আমাদের দিন চলে না।”

জামার পকেটের ভিতর হাত পুরে সমীরণ কি যেন অন্বেষণ কর্‌তে লাগ্‌ল। কিংশুক মৃদু হেসে টেবিলে রাখা কলিং বেল্‌টা টিপ্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে “বয়্‌” এসে দাঁড়াল। আর এক পিয়ালা চায়ের হুকুম করে কিংশুক সমীরণের দিকে তাকাতেই সে একখানা ফিকে গোলাপী রংয়ের কার্ড বার করে’ কিংশুকের হাতে দিলে।

সেখানি “At home” এর অনুষ্ঠান-পত্র। কিংশুক কার্ডখানি পড়ে সমীরণের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, “দেখ বন্ধু তোমার Tea, Music, Social এ আজ পর্য্যন্ত কোন দিনই যোগদান কর্‌বার সৌভাগ্য হ’ল না, অথচ আমাকে invite কর্‌তে তুমি কোন বারই ভোলোনা দেখ্‌ছি।”

“বয়” চা দিয়ে গেল। চা পান কর্‌তে কর্‌তে সমীরণ গম্ভীর গলায় বল্‌লে, “একদিন হয়ত সে সৌভাগ্য হ’তে পারে।” ঘড়ীতে ৯টা বাজ্‌লো। সমীরণ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, “চল্‌লুম্‌ ভাই, আরও অনেক-গুলো জায়গা ঘুরতে হ’বে। তোমাকে জোর করে’ আমাদের Meeting এ যোগদান করাবার শক্তি আমার নেই, তবু বল্‌ছি সুবিধে হয়ত’ যেও।”

ধীরে সে পর্দ্দা তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। মৃদুস্বরে এক্‌টা গান গাইতে গাইতে কিংশুক লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুক্‌ল—

সকল গগন বসুন্ধরা
বন্ধুতে মোর আছে ভরা
সেই কথাটি দেবে ধরা জীবনে,—
আমার গভীর জীবনে ॥

নিয়ে আস্‌ছে। পদ্মিনী অশোকার সতীর্থা। খুব ভাল গাইতে পারে বলে' তার নাম আছে। সকলের অনুরোধে উঠে অর্গান বাজিয়ে সে গান ধর্‌লে—

তোমার ভুবন মর্ম্মে আমার লাগে
তোমার আকাশ অসীম কমল
অন্তরে মোর জাগে।
এই সবুজ এই নীলের পরশ
সকল দেহ করে' সরস,
রক্ত আমার রঙিয়ে আছে
তব অরুণ রাগে।

সকলেরই মন সুরের সুধায় ভরে' উঠেছিল। বাহ্য জগতের কথা কারো মনে ছিলনা। গুঞ্জন ধ্বনি থেমে গিছল। সহসা সেই নিস্তব্ধতার মাঝে এসে দাঁড়াল এক তরুণ যুবক।

যুবকের গাত্রবর্ণ অতি গৌর। লম্বায় সে প্রায় ছফিট। সুন্দর মুখখানি ঘিরে সুদীর্ঘ কালোচুল বাতাসে উড়ছিল। অসাধারণ দীপ্তিময় তার চোখ দু'টি। তাকে দেখে সকলের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি উঠল 'কিংশুক' 'কিংশুক'। পদ্মিনী গান থামিয়ে বিস্মিত নেত্রে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকালো। সকলেরই দৃষ্টি কিংশুকের দিকে নিবদ্ধ হ'ল। সমীরণ সকলের সঙ্গে কিংশুকের পরিচয় করে দিলে। কিংশুক সমীরণ অনুষ্ঠিত উৎসবে এর আগে কখনও যোগদান করে নি। লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা কর্‌তে তার ভাল লাগ্‌তো না। আপনার সাহিত্য-চর্চ্চা নিয়েই সে দিনরাত মাতাল হ'য়ে থাকে। সুতরাং তার কবিতা পাঠ করবার সৌভাগ্য অনেকের হ'লেও তাকে দেখবার সৌভাগ্য অতি অল্পজনেরই ভাগ্যে ঘটেছে। কিংশুককে এখানে দেখবার আশা কেউ করে নি—

সমীরণও না—কারণ সে ভেবেছিল, প্রতিবারের মত এবারেও কিংশুক অনুপস্থিত থাকবে।

সকলের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আসন গ্রহণান্তর পদ্মিনীর দিকে চেয়ে কিংশুক বললে, মাপ কর্ব্বেন, আপনাকে বাধা দিলুম। আপনি আবার আরম্ভ করুন।

সলজ্জহাস্যে পদ্মিনীর নব তৃণের মত শ্যামল মুখখানি ভরে উঠল। তরুণ কবির অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান করলে না, আবার ধীরে গাইতে সুরু করলে—

আলো যে গান করে মোর প্রাণে গো
কে এল মোর অঙ্গনে, কে জানে গো।
মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
বাহির হ'ল কাহার খোঁজে।
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো

বেশ রাত্রি হয়েছিল। গান থামলে পর সমীরণ সকলকে খেতে আহ্বান করলে। খেতে খেতে আলোচনা চলতে লাগলো।

কিংশুক যে টেবিলে বসে খাচ্ছিল সে টেবিলের আর দু'টি চেয়ারের একটী অধিকার করেছিল পদ্মিনী, অপরটি সমীরণের ভগ্নী অশোকা। পদ্মিনীর দিকে চেয়ে কিংশুক বললে, আপনার গান আমার খুব ভাল লাগলো।"

সলজ্জ হাস্যে পদ্মিনী মুখ নামালো। কিংশুকের ঠিক পাশের টেবিলেই বসে সমীরণ খাচ্ছিল। সে বললে, আপনি জানেন না মিস্ মিত্র, কিংশুক খুব ভাল গায়।—

—তাই নাকি? এতক্ষণ বলেননি তো আপনি? এক্ষুনিই কিন্তু শোনাতে হবে আপনাকে।

# —দ্বারী-

## চরিত্রগণ

দ্বারী

মন্দার

শিখা

ব্যাধ

বাউল

বালক

রুদ্র

নাগরিকগণ

রাজসৈনিকগণ

আশাপথযাহীগণ

ভূত, প্রেতগণ

[বিশাল সোণার মন্দিরের রূপার দ্বার রুদ্ধ। দ্বারে বৃহৎ তরোয়াল হাতে আপদমস্তক কালো পোষাক পরিয়া দ্বারী দাঁড়াইয়া আছে।]

(নীল পোষাক পরিয়া মন্দারের প্রবেশ।)

দ্বারী। কে যায়!

মন্দার। আমি মন্দার!

দ্বারী। কি চাই তোমার?

মন্দার। তুমি মন্দিরের দ্বার খোল, ভিতরে যাই।

দ্বারী। কি সর্ব্বনাশ, মন্দিরের দ্বার খুলব' কি?

মন্দার। হ্যাঁ, তোমায় খুল্‌তেই হবে।

দ্বারী। সে হবে না, আমাদের রাজার হুকুম নেই।

মন্দার। আমি তোমাদের রাজাকে জানি না, আমি ভিন্ন রাজার দেশ থেকে এসেছি।

দ্বারী। আমাদের রাজার নিয়ম ভাঙলে সারা জীবন বন্দী হয়ে থাক্‌তে হবে। মন্দিরের দ্বারে হাত দিলে এই তরোয়াল দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেল্‌ব'। দ্বারের আশেপাশে কি আছে দেখ্‌তে পাচ্ছ?

মন্দার। হ্যাঁ!

দ্বারী। কি বল দিকিন?

মন্দার। মড়ার হাড় আর মড়ার মাথা!

দ্বারী। এসব তাদেরই হাড় যারা দুঃসাহস ক'রেছিল মন্দিরের দ্বার খুল্‌তে, ওদের কেউ বা তরোয়ালে মাথা দিয়ে ম'রেছে, কেউ বা মন্দিরের দ্বারে মাথা ঠুকে ম'রেছে, আর কেউ বা বন্দী হ'য়ে না থেতে পেয়ে ম'রেছে। সাবধান হ'য়ে থেকো বালক! মন্দিরের দ্বার খুলবার বুকের পাটা ক'রো না।

মন্দার। তোমরা মন্দিরের দ্বার খোল না কেন?

দ্বারী। এই আমাদের নিয়ম!

মন্দার। এমন নিয়ম করেছ কেন?

দ্বারী। তা জানি না।

মন্দার। সে কি?

দ্বারী। হ্যাঁ, আমাদের রাজবংশের জন্ম থেকেই এ নিয়ম চ'লে আস্‌ছে।

মন্দার। তোমাদের রাজত্ব কতদিন কার ?

দ্বারী। সে অনেকদিনকার, কবেকার তা আমাদের মনে নেই, এর কথা আমরা চিরকাল শুনে আস্‌ছি।

মন্দার। তুমি এখানে কতদিন আছ ?

দ্বারী। সারা জীবন ধ'রেই।

মন্দার। তোমার আগে এখানে কে ছিল ?

দ্বারী। আমার বাবা।

মন্দার। তার আগে ?

দ্বারী। আমার বাবার বাবা।

মন্দার। তার আগে ?

দ্বারী। তার বাবা। এমনি ক'রেইত' আমরা চিরদিন পুরুষানুক্রমে মন্দিরের দ্বার রক্ষা করে আসছি—এই আমাদের নিয়ম, এই আমাদের জীবন। যারা এই মন্দিরের দ্বার খুল্‌তে আসে তাদের কোন ক্রমেই আমরা ক্ষমা করি না। আমরা কেবল আমাদের নিয়ম পালন করি, আমাদের রাজা সেই নিয়ম রক্ষা করেন!

মন্দার। এ অর্থহীন নিয়মে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ হয় না ?

দ্বারী। এই নিয়মটীকে বাঁচিয়ে রাখবার ঝোঁকেই ত আমাদের প্রাণ ভ'রে আছে। আমাদের এ পুরাতন নিয়ম কেউ ভাঙ্‌তে এলেই আমরা চঞ্চল হ'য়ে উঠি।

মন্দার। আমাদের দেশে এ সবের কোন বালাই নেই।

দ্বারী। যাও, আর বেশী কথা কয়ো না, আমি আমার কাজে মন দিই।

[ দ্বারী স্থির হইয়া তরোয়াল কাঁধে মন্দিরের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল এবং মন্দার সম্মুখে বট গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রহিল। ]

( সবুজ পোষাক পরিয়া তীর ধনুক হাতে ব্যাধের প্রবেশ।)

মন্দার। তুমি কে ?

ব্যাধ। আমি ব্যাধ !

মন্দার। কোথায় যাচ্ছ ?

ব্যাধ। তীর ধনুক হাতে বাঘ শিকার ক'রতে যাচ্ছি।

মন্দার। মন্দিরের দ্বার খুল্‌তে যাবে না ?

ব্যাধ। না।

মন্দার। কেন ?

ব্যাধ। সে সাহস নেই।

মন্দার। তুমি এমন বীরপুরুষ হ'য়ে একথা বল্‌ছ ?

ব্যাধ। তা কি ক'র্‌ব' বল ! আমাদের নিয়ম-মন্দিরের দ্বার চিরকাল বন্ধ হ'য়ে থাক্‌বে। শুধু গায়ের জোরে তাকে কেউ কোনদিন খুল্‌তে পার্‌বে না। আমাদের কেবল গায়ের জোরই আছে।

মন্দার। তবে কিসে খুল্‌বে ?

ব্যাধ। তা জানি না, আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাই না।

[ ব্যাধের প্রস্থান ও অন্যদিক হইতে হল্‌দে পোষাক পরিয়া একতারা বাজাইতে বাজাইতে বাউলের প্রবেশ।

মন্দার। তুমি কে ?

বাউল। আমি বাউল !

মন্দার। তুমি কি কর ?

বাউল। আমি এই একতারা নিয়ে আপন মনে গান গেয়ে যাই। আমরা উদাসী, আমরা কোথাও বদ্ধ থাকি না।

মন্দার। মন্দিরের দ্বার খোল্‌বার গান তুমি গাওনা কেন ?

শিখা। এ ত্রিশূল, এতে আগুন জ্বলে, সব বাঁধন পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, এই নাও তুমি ত্রিশূল!

মন্দার। তুমি ত' আমার সব দিয়ে দিলে, তোমার তবে কি রইল?

শিখা। কেন, তুমিতো আমার রইলে!

মন্দার। এখন তবে আমরা কি করব?

শিখা। এই ত্রিশূলের ঘা মেরে আমরা মন্দির পুড়িয়ে দোব, তুমি কি জান না ও মন্দির একবারে ভুয়ো, ওরা মিথ্যা ক'রে ওকে আঁকড়ে ধরে আছে, শুধু আমাদের ভবিষ্যতের প্রাণের ধারাকে বাধা দিচ্ছে।

মন্দার। আমিও ত' মন্দির ভাঙতে এসেছি।

শিখা। সেই জন্যই ত' আমাদের মিলন হ'ল।

মন্দার। কিন্তু কেমন ক'রে ওখানে যাবে? দ্বারী যে বলেছে ওখানে গেলে আমাদের মেরে ফেল্‌বে?

শিখা। তবে তুমি আমায় ভালবাস্‌লে কি কর্‌তে? যারা ভালবাসে তারা মরে না, এ ত্রিশূল তাদের হাতে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে—এর কাছে তুচ্ছ ঐ মন্দির! যে জানে ভালবাস্‌তে সে ত সারা পৃথিবীর বুকে আগুণ জ্বালিয়ে দেয়, তাতে সব মিথ্যা পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।

উভয়ের গীত।

ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌
ওরে গর্জ্জন গান!
রুদ্র-বিষান বাজে সন্‌ সন্‌
তাণ্ডব ঐ তান!

আয় আয় সব ছুটে
প্রাণধন নে রে লুটে,
প্রাণের সাড়ায় প্রাণ পাবি সবে
প্রাণ কর আজি দান !
এই ভাঙ্গনের গান !

[ কোলাহল করিতে করিতে সাদা পোষাক পরিয়া
নাগরিকগণের প্রবেশ। ]

নাগরিকগণ। হা রা রা রা, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, মন্দির ভাঙ্গ, মন্দির ভাঙ্গ—

[ অন্যদিক হইতে কালপোষাক পরিয়া
রাজসৈনিকগণের দ্রুতপদে প্রবেশ। ]

রাজসৈনিকগণ। সাবধান ! সাবধান !

[ উভয় পক্ষের যুদ্ধ এবং কতিপয় নাগরিক ও রাজসৈনিকগণের পতন ও মৃত্যু ও বাকী সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান। ]

দ্বারী। মন্দিরের দ্বারের কাছে যে আস্‌বে তার মৃত্যু !

[ তরবারি ঘুরাইতে লাগিল। ]

শিখা। চল আমরা একপাশে দাঁড়াই গে।

মন্দার। কেন ?

শিখা। এখনও আমাদের সময় হয় নি। যখন ওদের চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে আস্‌বে আর আকাশে কালো মেঘের বুকে চক্‌মক ক'রে বিজলী চম্‌কে উঠ্‌বে, তখন এই ত্রিশূল জল্ জল্ করে জল্‌বে।

[ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ দেহ ভূত-প্রেতগণের সহিত শুভ্রদেহ রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে ও গাহিতে গাহিতে প্রবেশ। ]

গীত

তা তা থেই থেই থেই
ভেঙ্গে চল্, ভেঙ্গে চল্,
হা হা হা হা হা;
ত্রিশূল জ্বল্, ত্রিশূল জ্বল্!
কড় কড় কড় বাজ
ভেঙ্গে পড়ুক আজ,
রুদ্র আগুণ জ্বলুক দ্বিগুণ
জ্বলুক ধরাতল,
হা হা হা, জ্বলুক ধরাতল!

[ প্রস্থান। ]

[ ঘোর অন্ধকার ও ঘন ঘন বজ্রপতন। ]

শিখা। এইবার আমাদের সময় হ'য়েছে, ত্রিশূল জ্ব'লে উঠেছে!

দ্বারী। ওঃ আজ কি দুর্য্যোগ, আমাদের মন্দির কাঁপ্‌ছে!

শিখা। মন্দার!

মন্দার। শিখা!

শিখা। এইবার!

উভয়ে। ( উচ্চৈঃস্বরে ) জয় ত্রিশূলের জয়!

[ উভয়ে দ্রুতপদে মন্দিরে ত্রিশূলের আঘাত করিল এবং মন্দির জ্বলিয়া উঠিল। ]

দ্বারী। কে, কে, কে, সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল. আমাদের মন্দির গেল, গেল, গেল— [ মন্দিরের দ্বারে লম্বা হইয়া পড়িয়া গেল। ]

[ কোলাহল করিতে করিতে কাল পোষাক
পরিয়া রাজসৈনিকগণের প্রবেশ ।]

রাজসৈনিকগণ। রক্ষা কর, রক্ষা কর, মন্দির রক্ষা কর, রাজা মশাইকে খবর দাও, রাজা মশাইকে খবর দাও, দ্বারী, দ্বারী—

[ মন্দিরের সম্মুখে একে একে পতন ও মৃত্যু । ]

মন্দার। শিখা ! আমার গা জ্বলে গেল ! কি আগুন !

শিখা। আমিও জ্বল্‌ছি, মন্দিরও জ্বল্‌বে, আমরাও জ্বল্‌ব। আগুনের সোঁ সোঁ শব্দের ভিতর নব জীবনের সঙ্গীত শুন্‌তে পাচ্ছ ?

মন্দার। হ্যাঁ, কি মধুর ! আঃ-! ( পতন )

শিখা। মন্দার ! মন্দার ! নূতন সৃষ্টি, নূ—ত—ন—সৃ—ষ্টি !

( পতন )

[ উভয়ের মৃত্যু ।]

( পট পরিবর্ত্তন । )

[ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হাতে নানারঙের পোষাক পরিয়া আশাপথ বাহীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ।

গীত

নাচে জীবন রে, নাচে জীবন রে !
কভু রুদ্ররূপে, কভু মধুর রে,
কভু ছন্দ বাজে, কত রূপ সাজে,
কত নর্ত্তন মর্ত্তন তর্জ্জন রে !

# —চিত্রকর-

সতীশ ছবি আঁকে, আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব্ব এক কৃতী ছাত্র। আঁকতে পারে ভালো, বয়স চব্বিশ পঁচিশ হ'তে না হ'তেই যথেষ্ট নাম হয়েছে; অনেক সম্পাদক সতীশের ষ্টুডিওতে যাতায়াত করে থাকেন, কেউ চান প্রচ্ছদপট আঁকাতে, কেউ চান ভিতরের রঙীন্ ছবি,কেউ চান ব্যাগারে কাজ মিনি পয়সায় আর কারো বা ইচ্ছা সস্তায় কিস্তিমাৎ করা। কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে লোকটা এই সব খরিদ্দারকে নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামায় না! সে হচ্ছে কিছু খামখেয়ালী গোছের লোক এবং নিজের ঘরে বসে এঁকে যায় চিত্রের পর চিত্র কত বিচিত্রভাবে, কত রঙের খেলা খেলে যায় ক্যাম্বিসের উপর তার নিপুণ তূলির স্পর্শে। সতীশ সাধারণের কাছে তার ষ্টুডিওর পরিচয় দেয় কারখানা বলে। এই কারখানা নামে অভিহিত চিত্রশালাটি অবস্থিত হচ্ছে একটা সরু গলির মধ্যে একটা ভাঙা গোছের বাড়ীর ওপরের ঘরে। ভাঙা পোড়ো বাড়ী! কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে তার মধ্যে এত ঐশ্বর্য্য লুকানো আছে সকল লোকের চোখের আড়ালে। সহরের লোক তার ঘরে ঢুকলে মনে করে এ কোন স্বপ্ন-পুরীর মধ্যে এসে পড়লুম।

এই স্বপ্ন-পুরীর মালিক সতীশের বাপ-মা ছিল না, ছেলেবেলা থেকেই মামার বাড়ীতে মানুষ সে। যখন স্কুলে যেত তার অ,আ চিন্‌তে লেগেছিল খুব বেশী সময়, কিন্তু বইয়ের দু'তিন পাতা পড়া হতে না হতেই দেখা যেত বইয়ের সব ক'খানা পাতা পেন্সিল এবং কালীতে

আঁকা নানারকম কুকুর বেড়ালছানা এবং ফলেফুলে ভর্ত্তি হয়ে উঠেছে। অবশেষে যখন দেখা গেল যে অনেক চেষ্টার পর পড়াশুনা একরকম এগুতেই চায় না এদিকে আঁকড়িজুকড়ি আঁকার দিক দিয়ে হাত একেবারে পেকে উঠছে তখন মামারা তাকে আর্টস্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। এই হ'ল তার বাল্যের ইতিহাস।

এখন সতীশ তন্ময় হ'য়ে থাকে তার ছবির ধ্যানে; অন্য কোনো জিনিষ তার মাথায় ঢোকে না এবং সেও বাইরের কোনো জিনিষ নিজের মাথায় ঢোকাবার প্রয়োজন বোধ করে না।

( ২ )

সতীশকে তার যে কটি আপনার লোক ছিল সবাই ধরে পড়লো বিয়ে কর্‌তে হবে। সতীশ নিজের আপত্তি জানালে—তার জীবনের কোনো কিছুর স্থিরতা নেই, সে একজন নতুন লোককে অনর্থক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারে ঢুকিয়ে কষ্ট দিতে পার্‌বে না ইত্যাদি বলে। কিন্তু পীড়াপীড়ি করে তার অনেক কল্পনা নষ্ট করে এবং বহুবার শান্তি ভঙ্গ করে সতীশকে রাজী করানো হ'ল। তাকে জানানো হ'ল বাঙালীর ঘরের ছোট খুকীরা ভারী শান্ত মেয়ে হয় এবং একটি ছোট মেয়েকে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল।

প্রথম, প্রথম সতীশের বিয়ে হ'ল কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, সে এইখানেই তার ছোট্ট পত্নী কমলার প্রতি সব কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে মনে ক'রে আবার ছবির রাজ্যে ফিরে গেল। আর কমলাও নিজেকে পুতুল খেলার মধ্যে নিমগ্ন ক'রে দিলে। এমনি ভাবে দিন যেতে যেতে একদিন সতীশের মনে হ'ল তার দিনগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে চলেছে, খানিকটা বৈচিত্র্য দরকার, স্ত্রীকে নিয়ে, স্ত্রীর সঙ্গলাভ ক'রে নিজের ক্লান্তি দূর করবার চেষ্টা কর্‌লে কিন্তু বালিকা স্ত্রী তার নবোদ্গত

কাঠির পরশ দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে। আর কমলার কি এই দিনের পর দিন প্রতীক্ষা ক'রে থাকা বৃথাই হবে! এমনই সব কত কথা মনে আসে রাতে শুয়ে শুয়ে। কখনো মনে পড়ে ছেলেবেলার সঙ্গিনীদের কথা, তাদের সকলেরই এখন বিয়ে হয়ে গেছে। এক সময়ে দূরপল্লীতে কজনে মিলে খেলা হত বউ বউ, পুতুলের বিয়ে—যেন সব সত্যিকারের ঘরকন্না। তারপর সে খেলাঘর ভেঙে গেল যখন একে একে সকলের বিয়ে হ'য়ে গেল এবং খেলাঘরের বদলে জীবন্ত সংসার গড়ে উঠ্‌লো সব দূরে দূরে। আর কারো সঙ্গে কারো বিশেষ দেখা হয় না। কিন্তু তার—তার এরকম হ'ল না। শুধুই পথ চেয়ে থাকা, শুধু উপাধান চোখের জলে ভেজানো রাতের পর রাত। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে লোক মুখে বা মাসিক পত্রের পাতায় সতীশের ছবি বা তার ছবির প্রশংসার গর্ব্বে কমলার বুকখানা ভরে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে পড়ে যায় এতে তার গর্ব্বের কি আছে। সতীশ কে তার? কই, কেউ নয় তো! কোন এক ভুলে-যাওয়া দিনে, সে কথা আজ মনে পড়ে কি না পড়ে, অনেক বাঁশী আলো, আশা আনন্দের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তার পর থেকে এ লোকটির অস্তিত্ব মনে কর্‌বার আর কারণ ঘটেছে কি? শুধু দূরাগত খারাপ খারাপ খবর পেয়ে মনটা খালি ব্যথাতেই ভরে উঠেছে। আচ্ছা তার জীবনটা এই স্বামী ব'লে লোকটার সম্পর্ক থেকে, স্মৃতি থেকে কি একেবারে বিমুক্ত, বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে শুধু তার নিজেকে নিয়ে গড়ে তোলা যায় না! যেখানে আর কেউ থাক্‌বে না, থাকবে শুধু সে আর সে! নাঃ, তা আর কি করে হবে। এ যে শোনা যায় জীবন মরণের সম্বন্ধ! কিন্তু একটা কথা, এই যে লোকটার সঙ্গে তার কত বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে, তার সারা অঙ্গে যৌবনের হিল্লোল বহে চলেছে, সে যে

দেবতার কাছে নিবেদন করবার ফুলের মত পথ চেয়ে বসে আছে কিন্তু কই এ ত একবার ফিরেও চায় না। অথচ একি তার জন্মজন্মান্তরেও স্বামী হ'বে ? দূর ! তা অসম্ভব ! আর যদি তা' হয় তা' হ'লে বুঝতে হবে এটা বিশ্ববিধাতার অবিচার বা তার ওপরে একটা বিরাট অভিশাপ আছে।

( ৪ )

তারপর একদিন সবাই দেখে কমলার মুখে আর হাসি ধরে না, শুকনো মুখ আজ অন্তরের আনন্দ আভায় উজ্জ্বল ! সবাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল কিন্তু মুখে কেউ কিছু বল্‌লে না কারণ সবাই তার জীবনের করুণ কাহিনী জান্‌তো। খালি তার মামাত ননদ বল্‌লে, হাঁলা, মর্‌তিস মুখ শুকিয়ে, রাত কাটাতিস সবার চোখের আড়ালে কেঁদে কেঁদে, আজ আবার পোড়ার মুখে হাসি ফুটলো কোথা থেকে। তবে কি দাদার মন ফিরলো, দাদা কি তোর শ্রীচরণে মজলেন।

কমলা হেঁসে বল্‌লে 'দুর তা' কেন, তেমন কপাল কি করেছিলুম ভাই ; তা নয় তবে ভেবে দেখলুম যে একজন ত দিব্বি আরামে কাটাচ্ছে তবে আমিই বা কষ্ট করে মরি কেন। সারা রাত্তির কেঁদে কাটাই এ সব কিন্তু ভাই তোর বানানো কথা বরং তুই একদিন রাত্তির বেলা আমার কাছে শুয়ে দেখিস্।'

একদিন কমলা বাড়ীর একটি ছোট মেয়েকে দিয়ে সতীশের কাছে তার ষ্টুডিওর চাবি চেয়ে পাঠালে। সতীশ একটু অবাক হ'য়ে গেল। কারণ কমলার যা প্রাপ্য সতীশ কোনো দিন তাকে তা দেয় নি আর সেও এই অন্যায় বিচার মাথা পেতে নিয়েছে মুখটি বুজে, কোনো দিন কোনো আপত্তি করে নি। আজ তবে সে ছবির ঘরের চাবি চেয়ে বস্‌লে' কেন ? একবার ভাবলে জিজ্ঞাসা কর্‌বে, কি দরকার। তারপর

# —আদেশ—

কুশল ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন জীবিত ছিলেন, তাঁহার দান ধ্যান, ক্রিয়া কলাপ, মান সম্ভ্রম দেখিয়া সারা দেশের লোক মনে করিত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাগ্যবান পুরুষ এবং ধনে পুত্রে তাঁহার লক্ষ্মীলাভ হইয়াছে। কিন্তু তিনি লোকান্তরে গমন করিলে সেই পোড়া দেশের লোকই তাঁহার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খাইয়া গিয়া অযাচিতভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল—ভট্চাযের ছিলনা বিশেষ কিছুই। থাকিবার মধ্যে ছিল মাত্র একখানা বাড়ী; পাওনাদারকে ফাঁকি দিবার জন্ম সেখানিও বিক্রয় কোবালা করিয়া তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে দিয়া গিয়াছেন। সে কারণে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পথের কাঙ্গাল হইয়াছে।

জনরবের সহস্র জিহ্বায় স্থান পাইয়া মন্তব্যটা শেষে এমন আকার ধারণ করিল যে তাহা শুনিয়া কুশল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাদেবকে মনে মনে বলিতে হইল—"বসুন্ধরে দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।" মহাদেব তাহার কনিষ্ঠ সহোদর মহেন্দ্রদেবকে একদিন একাকী পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"—এ কি শুন্‌ছি ভাই?"

বিস্ময় [illegible] নেত্রে মহেন্দ্রদেব প্রতি জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের কি দাদা?"

"এই বাবার ঋণের কথা—বাড়ী বিক্রয়ের কথা—"

অপ্রসন্ন [illegible] মহেন্দ্রদেব কহিল—হাঁ, সেত সবই ঠিক কথা। তুমি কি জান [illegible]?

—"কিছুই না। যা'ক্ তা'তে আর হয়েছে কি ? তা' হ'লে ঋণের কথাও সত্য ?"

"—মৃত্যুর মতই সত্য। খরচে লোকের যা' হয়ে থাকে, তাই। বাড়ীটা যদি রক্ষা কর্‌তে পারা যায়, এই ভেবেই টাকাটা অন্য জায়গা থেকে জোগাড় ক'রে—" "কৈফিয়ৎত চাচ্ছিনা ভাই। কেবল জিজ্ঞাসা কর্‌ছি' বাড়ীই যদি খিক্রি হ'ল, বাবার ঋণ শোধ হ'লনা কেন ?"

অভিজ্ঞতার অভিনয় করিয়া খুব গম্ভীর ভাবে মহেন্দ্র কহিল—"বাবা ঋণ—অনন্ত, তাঁর আর শোধ হ'বে কেমন ক'রে বল দাদা ? তবে বাড়ীখানা যে আট্‌কে রেখেছি, সে কেবল বুদ্ধি ক'রে !"

আপনার মাথার দীর্ঘ কেশগুলা একটু জোর করিয়াই টানিতে টানিতে মহাদেব বলিল—

—"ও বুদ্ধিটা খুব সুবুদ্ধির পরিচয় নয় মহেন্দ্র ! পিতৃঋণ, বুঝেছ—পিতৃঋণ"—মহাদেব আর কথা কহিতে পারিল না। কাজল মেঘের বাদল ধারার মত তাহার চক্ষু দিয়া তখন অশ্রু বহিতে লাগিল। মহেন্দ্র দেবের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল, সেই প্রসঙ্গে সে আরও কিছু বক্তৃতা করে। কিন্তু মহাদেবের অবস্থা দেখিয়া তাহা করিতে তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

( ২ )

আশ্বিন মাস—এবার মাসটা পড়িতে না পড়িতেই মহাপূজার আয়োজন চলিতেছে। মহাদেবের পুত্র সরলকুমার কলেজ হইতে আসিয়া পিতার ঘরে ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া কহিল—

—"বাবা, কলেজ বন্ধ হচ্ছে ৫ই, কলেজের মাহিনা আর জরিমানার টাকা কাল একটার মধ্যে জমা না দিলে নাম কাটা যা'বে ।"

আবিষ্টের মত খানিকক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহাদেব জিজ্ঞাসা করিল—

—"কেন, তোমার কাকাবাবু মাইনে দেন নাই ?"

—"না, বলেছেন—টাকা কড়ির যেরকম অবস্থা, তা'তে এবার পূজোর কাপড় চোপড়ই হ'বেনা ত, কলেজের মাইনে ।"

—"তা' হ'লে নাম কাটা যাওয়াই ভাল ।"

—"আপনি কি বল্‌ছেন বাবা !"

—"ঠিক্ বল্‌ছি ধন, তুই সে কথা বুঝ্‌তে পারবিনি । যে লেখাপড়ায় মানুষ তৈরী হয়না সে লেখা পড়া নাই বা হ'ল । তার চেয়ে কোদাল পেড়েও যদি সংসারে সুখ শান্তি আন্‌তে পারা যায়, সেটা লক্ষগুণে ভাল ।"

পুত্র বিরক্ত হইয়া পিতাকে বলিল—

—"আপনি কখন যে কি বলেন বাবা, আমি কিছুই বুঝতে পারিনা ।"

মহাদেব হাসিয়া বলিল—"খাঁটিকথা বুঝা একটু শক্ত বাবা । সেদিন যখন এসে বলেছিলি, একটা উৎসব গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে গিয়ে তোর খোপ দুরস্ত কাপড় চোপড় ছিলনা ব'লে আহ্বাহক তোকে অতিথির প্রাপ্য সম্মান দেয় নাই, সেদিনও একথা ব'লে ছিলাম, আর আজও তাই বল্‌ছি—"

পিতৃদেবকে কথা শেষ করিতে না দিয়া পুত্র উত্তেজিতভাবে কহিল—"শুধু তা'রা কেন, কাকাবাবুর ছেলে অবনীও তো হাজার কথা কয়েছিল ।"

প্রমাণ হইয়া যাইবে। পাড়ার লোকও মহাদেবের পক্ষ হইয়া সেই কথাই আদালতে বলিয়া আসিবে। তখন সম্পত্তি চুল চিরিয়া বখ্‌রা হওয়া ভিন্ন ত আর উপায় থাকিবে না।

মহেন্দ্রদেব চিন্তার সমুদ্রে পড়িয়া গেল। সে একবার ভাবিল—কিছু টাকাকড়ি দিয়া দাদার সহিত ব্যাপারটা সে মিটাইয়া লয় কিন্তু বিত্তই যাহার সর্ব্বস্ব, এরূপ সহজ ভাবে মিটমাট করা তাহার পক্ষে সহজ নহে। বিশেষ, অবনী বিলাসিতার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া সে সময়ে যে ভাবে টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছে, তাহাতে টাকা দিয়া দাদার সহিত মিটমাট করিতে মহেন্দ্রের একবারেই মন সরিল না। তখন সে আইনের ব্যাসকূটের বিচার করিতে বসিল। কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া অগ্রজকে সে মনে মনে খণ্ড বিখণ্ডিত করিতে লাগিল। পত্নীর পরামর্শ লইয়া তবে সে রাত্রে তাহার নিদ্রা হয়। পত্নী পরামর্শ দিয়াছে —"দেখা যাক্‌না, কত দূরের জল কত দূরে গড়ায়।" জল কিন্তু একেবারেই গড়াইল না। মাসখানেক পরে মহাদেব কাশীধামে অন্নপূর্ণা ক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিল—সরল ও সরলের মাতাও সে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আপত্তি করে নাই। মহাদেবের উকীল মহেন্দ্রদেবকে একখানা রেজেষ্টারী দলিল পাঠাইয়া দিয়াছেন—তাহাতে লেখা ছিল, মহাদেব সুস্থ শরীরে বাহাল তবিয়তে বলিতেছে, মহেন্দ্র দেবের সম্পত্তিতে তাহার বা তাহার পুত্র সরলকুমারের অথবা সরলকুমারের ভবিষৎ বংশধরগণের কোনই অধিকার নাই।

মহাদেব আর ফিরিল না। মহেন্দ্রদেব অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কেবলই ডাকিতে লাগিল—দাদা ফিরে এস, দাদা ফিরে এস।

কিন্তু মহাদেব সে কথা কাণেও তুলিল না। সরলকুমার বহুকাল পরে আর এক শারদীয়া উৎসবকালে একবার আসিল বটে—তখন

মহেন্দ্রদেব, পুত্রের অপরিণামদর্শিতার ফলে নিঃস্ব, নিঃসহায়, নিসম্বল আর অবনীকুমার দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী। ব্যবসায় বাণিজ্যে সরল লক্ষীলাভ করিয়াছিল। মহাদেবের আদেশ হইল—সরল কুমারই তাহাদের ভরণ পোষণ করিবে। সরলকুমার সে আদেশ মাথা পাতিয়া লইল।

শ্রীমৃণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

# —বিধির বিধান—

কর্ম্ম জীবনে প্রবেশ করে অবধি নিশ্চিন্ত মনে বসে "আরাম" জিনিষটা একেবারে ভুলে গেছলুম। সকালে উঠেই Collageএ attend করা, আর সারাদিন ধরে রক্ত, পুঁজ, ঘাঁটাই আমার এক রকম অভ্যাসগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাত্তির বলে যে একটা সময়, লোকে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম কর্ত্তে পায়, আমার ভাগ্যে তাও সব সময় ঘটে উঠ্‌ত না। এই ভাবে আমার জীবনের দিনগুলো বৈচিত্র্যহীন হয়ে কেটে যাচ্ছিল।

*　　*　　*　　*

কিন্তু আমার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যেও হঠাৎ একদিন বৈচিত্র্যের আভাস মিল্‌ল। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে' শরীরটা বড় অসুস্থ বোধ হতে লাগ্‌ল। তাড়াতাড়ি করে querterএ ফিরে এলুম। মাকে অসুস্থতার কথাটা জানিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিতে হ'ল। তারপর থেকে কিভাবে আমার দিন কেটেছে···কিছুই টের পাই নি। হঠাৎ একদিন চেয়ে: দেখি Principle সাহেব বিছনায় পাশে বসে রয়েছেন আর আমি শুয়ে আছি। অপ্রস্তুত হয়ে উঠে বস্‌তে গেলুম··· মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। তাব গতিক দেখে, তিনিও বেশ গম্ভীর মেজাজে আমার কলেজে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস্ কর্‌তে আরম্ভ করে দিলেন। আরও অপ্রস্তুত হয়ে দোষ স্বীকার কর্‌লুম। আর এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই Principic সাহেবের অট্টহাস্যে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

আমাকে হতভম্বের মত দেখে Principle সাহেব একে একে কলেজের প্রত্যাগমনের পরদিন থেকে এই ২১শ দিনের একটা লম্বা ফিরিস্তি দিলেন। তারপর আমার হাতদুটোকে নিয়ে মার হাতে দিয়ে, আধা বাঙলায় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর থেকে দিনের পর দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে লাগ্‌লুম। কিন্তু তখনো মনটার মধ্যে কেবলই patient দের চিন্তা উঁকি মার্‌তে লাগ্‌ল···তারা যেন আমার প্রত্যাগমনের পথ চেয়েই বসে রয়েছে। এই ভাবে যত দিন যেতে লাগ্‌ল আমিও ততই নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হতে লাগলুম। সেদিন সকাল বেলা মাথাটা বেশ পরিষ্কার মনে হল। বিছনাতে বালিস্‌টা হেলান দিয়ে Anatomyর বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ছি, এমন সময় Collageএর চাপ্‌রাসীটা Peon বইখানা হাতে করে সামনে এসে দাঁড়াল। বিছনার পাশেই টেবিলটার ওপর খাতাখানা খুলে পেন্‌-সিলটা হাতে দিলে, একটা সই করে খামটা ছিড়ে ফেল্‌লুম। চিঠিটায় দেখি যে আমার Collge থেকে তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। বিনা দরখাস্তয় ছুটি মঞ্জুর দেখে বেশ আনন্দ বোধ হল। কিন্তু আবার Principle সাহেবের চিঠিটায় দেখি, যে তিনি আমায় শীঘ্র কোথাও Changeএ যেতে আদেশ করেছেন। এ আবার কি বিপদ হল····· Changeএ যাওয়ার মধ্যে দেশে ঘুরে আসাই আমার change ছিল। তবে patientদের উপদেশের কসুর কখনও করিনি। এবার নিজের ওপর সেই chargeএ যাওয়ার আদেশ শুনে, তাড়াতাড়ি মাকে ডেকে principle সাহেবের হুকুমটা জানালুম। মা কিন্তু এ কথা শুনে বল্‌লেন—

"কেন আমি ত সব ঠিক করে ফেলেছি যতীন। আমরা আস্‌ছে সপ্তাতেই ত বেরিয়ে পড়ব।"

থেকে, হয়ত আমার মতও একটা লোক, অনেকটা শান্তি উপভোগ করত। একদিন লেখাপড়ার ভেতরেও সেলি, বায়রণ থেকে সুরু করে আমাদের দেশস্থ মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কারও বই পড়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হইনি। বই পড়াটা আমার একটা মস্ত অভ্যাস ছিল, তবে নিজের মধ্যে সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়ার চেষ্টা কখন করিনি আর সে সবগুলো অপেক্ষা Anatomy টাই লাগত ভাল আর সেটাকে নিয়েই শরীরপাত করতে সুরু করেছিলুম। রোজ সেই বালীর স্তূপটায় বসে সূর্য্যাস্ত দেখতুম আর মনটার মধ্যে নানা রকম ভাব জেগে উঠ্‌ত। ছেলেবেলায় শিখেছিলুম বাঁশী তাও এই Anatomyর চাপে একেবারে তলিয়ে গেছে। আবার সেই সব কথা মনে পড়ত.. ...ছেলেবেলায় আমি বাজাতুম বাঁশী আর সে গাইত গান।

* * * *

দু' মাস এই ভাবে বেশ কেটে গেল, মনটার সঙ্গে শরীরটাও বেশ সেরে উঠতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি সুরু হওয়ায় খুব সকাল সকাল বাড়ীতে ফিরতে হল। বাড়ী ফিরে এসে একখানি পুরানো নবযুগ টেনে নিয়ে অলসভাবে চোখ বোলাতে লাগলুম। হঠাৎ অমিয় মিত্রের লেখা "পথিক বন্ধু" বলে একটা গল্পের ওপর চোখ পড়ল। লেখক এই গল্পে সমুদ্রের সুন্দর বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি পড়ে আমার নেহাৎ অকবি মনও কিছুক্ষণের জন্যে যেন কেমন উদাস হ'য়ে এল। মনে হ'ল, আমি যদি কবি হতুম পুরী আসা তবেই যেন আমার সার্থক হ'ত।

একবার, দুবার করে অনেকবার পড়েও যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না। এত তন্ময় হয়ে গেছলুম যে বাইরে কে একটা লোক বার বার করে কড়া

*  *  *  *

কাছেই বাড়ী···পৌঁছুতে বেশী দেরী হল না। আমাকে বাইরের ঘরটায় বসিয়ে তাড়াতাড়ি সে ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বল্লে "আপনি শিগ্‌গির ভেতরে আসুন।"

একটা আলো হাতে করে, আমাকে ভেতরের পথ দেখিয়ে রুগীর ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলুম, এক বৃদ্ধ একটী তরুণীর অচেতন দেহ কোলে করে বিছানার ওপর বসে রয়েছেন। আমাকে দেখেই বৃদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠ্‌লেন—

"বাবা যতীন, আমার লীলার কি হল বাবা! আমার শত চেষ্টা বুঝি পণ্ড হল!" রুগীর দিকে চেয়ে চমকিত হয়ে বলে উঠলুম "জেঠা-মশায়, আপনারা—এখানে কবে এলেন?"

"সব কথা হবে বাবা—আগে আমার লীলাকে দেখ।" তাড়াতাড়ি কম্পিত হস্তে Pulseএ হাত দিয়ে সিউরে উঠলুম। বুঝলুম, লীলার লীলা ফুরিয়ে এসেছে—বড় জোর আর দু' এক দিন। প্রাণটার মধ্যে আগুন বয়ে গেল; ছেলেবেলাকার সেই সব কথাগুলো পর পর মনে আস্‌তে লাগ্‌ল। সেই গুরুমশায়ের পাঠশালায় আমাদের পরিচয়। একদিন এই লীলার বাবা তাকে সেখানে ভর্ত্তী করে দিয়ে গেলেন আর আসবার সময় বলে গেলেন তোর এই যতীনদাদার সঙ্গে রোজ আস্‌বি যাবি। তারপর যতদিন পাঠশালায় পড়েছিলুম সে রোজ আমার সঙ্গে যেত আর আস্‌ত। আমিও পাঠশালা ছাড়লুম, সেও সেই থেকে পাঠশালা ছাড়লে। আমি পড়তুম গ্রামের স্কুলে; সে পড়ত তার বাবার কাছে। সকালে বিকেলে রোজ আমাদের পুকুর পাড়ে দেখা হত...কত খেলা, কত গল্পই তখন আমাদের মধ্যে হত। স্কুল থেকে এসেই যেতুম তাদের বাড়ীতে...তখন লীলার মা ছিলেন, তিনি আমাকে

লীলার সঙ্গে রোজ খেতে দিতেন, আমিও অবাধে সে খাবারটুকু রোজ খেতুম। তারপরেই দুজনে বেরিয়ে পড়তুম খেলতে। শৈশবের দিনগুলো কি সুন্দর! সোমেদের বাগানটা ছিল আমাদের খেলার আড্ডা। আর সেই পুকুরের পাড়টার বসে লীলা গাইত গান, আমি একমনে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতুম। আমার গলাটা ছিল একেবারে যাকে বলে রাসভ-নিন্দিত। কতদিন লীলা আমায় গান শেখাবার চেষ্টা করেছিল, শেষে সে একেবারে হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর খেয়াল হল এবার থেকে লীলার গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাতে হবে। সেই থেকে তার গানের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বাজাতে শুরু করলুম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার গানের সঙ্গে বাঁশীর অনেক তফাৎ হয়ে যেত আর সেও গান থামিয়ে ফেলত। তারপর লীলার মার অসুখের সময় আমরা তার কাছে বসে থাকতুম। কত রকম গল্প তিনি আমাদের বলতেন, কোন কোন দিন আমাদের বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে আদর করে বলতেন—

"জানিস্ যতীন; আমি যদি কোনদিন ভাল হই ত তোদের আগে আপনার করে নেব বাবা।"

তারপরেই কিছুদিন বাদে লীলার মা মারা গেলেন। লীলাকে তোলাতে গিয়ে আমিও কেঁদে ফেলেছিলুম। সেই থেকে লীলাকে আমার মার কাছে এনে রাখতুম, সেও এই ভাবে মার শোক ভুলতে চেষ্টা করত। এই ভাবে স্কুলের পাঠ শেষ করলুম। আবার সেদিনটার কথা মনে পড়তে লাগল...সেদিনটা ছিল রাখী পূর্ণিমার রাত। সোমেদের বাড়ীতে আমাদের সত্যনারায়ণ পূজার নেমতন্ন—দুজনে সেখানে পূজা দেখতে গেলুম, সকলেই যে যার মনস্কামনা প্রার্থনা করতে লাগল। লীলা আর আমি মার ইচ্ছাটা যাতে পূর্ণ হয় সেই প্রার্থনাই সেখানে করেছিলুম। তারপর থেকে বিধির নির্ব্বন্ধে সে

# —সম্বন্ধ ভঙ্গ—

"পিসী, ও পিসী, ওঠনা ছাই, বাইযে!"

ভূতনাথের পিসীমা তন্দ্রার ঘোরে বলিলেন, "তা যানা বাছা।"

"বাঃ! বেশ লোকত? কেউ মরে, আর কেউ হরি হরি বলে! ওঠনা বলছি", কথাটা বলিয়া ভূতনাথ পিসীমাকে জোরে একটা ঠেলা দিল।

পিসীমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এঁ্যা, কি বলছিস ভূতো? ডাকলি আমায়?"

"না ডাক্‌বো কেন, তামাসা করছি! আমি যে আফিং খেইছি।"

"এ্যাঁ, বলিস কি? আফিং খেইছিস? ওমা, কি সর্ব্বনাশ হোলো গো! ওগো, তোমরা এসে দেখো গো, আমার ভূতো বুঝি যায় গো!"

পিসীমার কাঁসরের মত চাঁচাছোলা আওয়াজে ভাড়াটে বেহারীবাবু ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার গৃহিণীও গায়ের কাপড় চোপড় সামলাইতে সামলাইতে যত সত্বর সম্ভব ঢাকাই জালার মত দেহখানিকে দোলায়মান করিতে করিতে ভূতোর পিসীদের ঘরে আসিয়া হাজির হইলেন।

বেহারী বাবু প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "এ্যা, হয়েছে কি মাসী, এই রাত্তিরে?"

"ওগো, তোমরা দেখগো বাবু,ভূতো আমার কি সর্ব্বনাশ করলে গো! ওগো তোমরা পাঁচজনে বলগো, আমি কি দোষ করলুম যে, ভূতো আমায় ফাঁকি দিয়ে চললো গো, ওগো—"

"আরে, হয়েছে কি—"

"ওগো আর যে কেউ নেই গো আমার! ঐ যে শিবরাত্রিরের সল্‌তে টুকুগো! ওগো আমার হাতেই বাপ যে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলে গো!"

'আরে, কি মুস্কিল! মিছিমিছি চেঁচাচ্ছে দেখ। বলি হোলো কি?"

"ওগো আমি কিছু বলিনি গো! দুটো টাকা গো, ইয়ার বক্সীদের কালীঘাট দেবে গো! কেন মরতে দিইনি গো—"

বেহারী বাবু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন, 'না,মাসী ত কিছু বলবে না। ওরে ভুতো কি হয়েছে বল দিকি।"

ভুতনাথ ওরফে ভুতো ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি আফিং খেইছি।" তাহার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও ভয়ের রেশ ছিল। বেহারী বাবু তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এই কথা! আমি বলি আর কিছু।"

পিসীমা নয়নযুগল যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করিয়া বলিলেন, "এঁ্যা, বল কি, আরও কিছু? ছেলে আফিং খেলে সেটা কিছু নয়?"

"তুমিও যেমন মাসী, ও সেই ছেলে কিনা, তোমায় ভয় দেখাচ্ছে টাকা আদায়ের জন্যে। চল, চল, শুইগে যাই। ভাল আপদ! রেতেও ঘুমোবার যো নেই।"

কথাটা বলিয়া বেহারীবাবু নিজের ঘরের দিকে চলিলেন। পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওমা চললে যে বোনপো? ছেলেটার একটা হিল্লে করে যাও।"

ভুতো বলিল, 'বেশ, তোমরা ঝগড়া করতে থাক, আমি আফিং খেইছি কিনা, এদিকে আমি মারা যাই। বেশ!"

বেহারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তুমি খেপেছ মাসী—ও ছোঁড়া আফিং খাবে? আফিং খেলে এতক্ষণ হাত পা খিচ্‌তো, মুখ দিয়ে গাঁজা উঠ্‌তো, পেট ফাঁপতো। এই ভুতো, সত্যি কি করিছিস্ বল্।"

ভূতো বলিল, "আফিং খেইছি।"

"কতটা ?"

"এই এতটা।"

বেহারী বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ভূতো আফিংয়ের যে পরিমাণ দেখাইয়াছিল, তাহা একটা সর্ষপের আকারেরও হইবে কিনা সন্দেহ। তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ মাসী, ছেলেটার মাথা তুমিই খাচ্ছ। যার প্রাণের ভয় এত যে, সর্ষে ভোর আফিং গালে দিয়ে পিসীকে ডাকে বাঁচাতে সে সত্যি আফিং খাবে ? তোমায় বলে দিচ্ছি, একটা পয়সাও ওর হাতে দিও না। গোল্লায় গেল একেবারে, গোল্লায় গেল !"

বেহারী বাবু সস্ত্রীক নিজের শয়ন কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। পিসীমা তখন রাগে ফুলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও হতচ্ছাড়া মুখপোড়া ! আমার সঙ্গে মস্কারা ? বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

পিসীমা দাঁড়াইয়া উঠিতেই ভূতো এক লম্ফে শয্যাত্যাগ করিয়া দ্বার-দেশে উপনীত হইল এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, "বয়ে গেল, তোর ভাত আর নাই খাব। ওঃ ভারী ত পিসী ! চল্লুম এক্ষুনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে।"

( ২ )

যাই কোথা ? খাই কি ? পিসীর নোনাধরা পাঁজর-বার-করা বাড়ীখানার ইঁটচুণ, না জানালা গরাদে ? বুড়ীর আর সব ভাল, কেবল পয়সা কড়ি বাহির করিবার সময় বেটী যেন 'যক্ষি' !

দিবা দ্বিতীয় প্রহরের কাটফাটা রৌদ্রে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ভূতনাথ আপনার সুখ দুঃখের কথা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল। সেই যে সে শেষ রাত্রিতে পিসীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহার পর-প্রভাতে ডেপো হরির অপেরার আড্ডায় এক ছিলিম গাঁজার

সরকারের অযাচিত মুরুব্বিয়ানা। পিতা সরকারী ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করিয়া মাসে নগদ ২২ টাকা ১০ আনা ৭ পাই উপার্জ্জন করিতেন আর মাতৃহীন পুত্রকে লইয়া ভগিনীর গৃহে 'মানুষ' করাইয়া লইতেন। তাঁহার ইহলোকের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে মাসিক ২২টি টাকাও ছুটি লইয়াছিল ভরসা তখন পিসীর ঐ বাড়ী ভাড়ার ২০টি রজতমুদ্রা। শৈশবে সে মাতৃহারা। তাহার গর্ভধারিণী সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিলেন,—অধিক কাল জীবিত থাকিলে এমন পুত্ররত্নকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রত্নগর্ভা নামে আপনাকে পরিচিত করিবার অবসর দান না করিয়াই তাহার এক বৎসর বয়সেই ইহলোক হইতে ছুটি লইয়াছিলেন। তবে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধিও যে ছিলনা এমন কথাও বলা যায় না, কেননা তিনি যদি সূতিকাগারে স্তন্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার রত্নের মুখে কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া যাইতেন তাহা হইলে দুঃখিনী বসুন্ধরার গুরুভার বহুল পরিমানে হ্রাস হইত, সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথকে আজ দগ্ধ জঠরের জ্বালায় দ্বিপ্রহরে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ভাবিতে হইত না। ভূতনাথ আজ সঙ্কল্প করিয়াছে. ঘরে ফিরিবে না, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবে তবু পিসীর ভাত খাইবে না। কিন্তু গঙ্গার কাছে আসিয়া—বাপরে! যে ঢেউ, জলে নামিতে পা কাঁপে যে, বুক গুরু গুরু করেই ত!

হঠাৎ ভূতনাথের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। ঘাটের সোপানের উপর এক পার্শ্বে একখানা নামবলি আর একটা তামার ঘটি না? ব্রাহ্মণ নাভি-জলে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপাহ্নিক করিতেছিলেন। পাণ্ডারা অনেকে আহারের যোগাড়ে বাসায় চলিয়া গিয়াছে, যে দুই এক জন আছে তাহারা চাঁদনীর মধ্যেই কাপড় বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছে। এই ত সুযোগ।

ভূতনাথ সোপান বাহিয়া গঙ্গাজলে অবতরণ করিল। চোখে মুখে জল দিয়া উঠিয়া আসিবার সময় ভ্রমক্রমে না বলিয়া নামাবলি ও ঘটিটা

চোর বাগানে পাড়ি জমাইল। ব্রাহ্মণের নামাবলি খানি স্কন্ধে ফেলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিল। তাহার পায়ে জুতা বা গায়ে জামা নাই, এক কাপড়েই সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল। পুরাতন দ্বারবান তাহাকে চিনিত, সে বাড়ী গিয়াছিল। বদলী নূতন দ্বারবান তাহার গায়ে নামাবলি ও পায়ে জুতা নাই দেখিয়া বাড়ীর গুরু পুরোহিতের সন্তান মনে করিয়া প্রণামান্তে ভিতরে ছাড়িয়া দিল। ভূতনাথ সরকারদের ঘরে না ঢুকিয়া সরাসরি কাঠের সোপান বাহিয়া দ্বিতলে মোহিতচন্দ্রের বৈঠকখানায় হাজির হইল। মোহিতই এখন মালিক, আজ তিন বৎসর হইল সে পিতৃহীন।

ভূতনাথ কক্ষে প্রবেশ করিতে প্রথমটা সঙ্কোচ বোধ করিল। আধুনিক ফ্যাসানে নানা মূল্যবান আসবাব পত্রে কক্ষখানি সজ্জিত—ভূতনাথ একহাঁটু ধূলা সমেত সুন্দর কার্পেটের উপর পাদবিক্ষেপ করে কিরূপে? কিন্তু ভূতনাথের সঙ্কোচ বা দ্বিধা ক্ষণস্থায়ী মাত্র,—উহা তাহার স্বভাব। সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি কোমল সোফায় অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া পড়িল। দেওয়ালে চমৎকার ইংলিশ ক্লক্ টিক্‌টিক্ করিতেছিল—ভূতনাথ চাহিয়া দেখিল, প্রা॥ ৬টা। উঃ এত বেলা হইয়াছে? তাহার কাজ অনেক, হালফীল সন্ধ্যার পরই ভেঁপো হরির আড্ডায় দিয়া চরসের ছিলিম চড়াইতে হইবে। চরস, গাঁজা বা তামাক সাজা তাহার একচেটিয়া ছিল। হারু গোয়ালা বলিত, ভূতোর হাতের সাজা কল্কে যেমন মিষ্টি লাগে এমন কাহারও না, আর জন্মে নিশ্চয়ই সে কোন নবাবের হুঁকাবরদার ছিল। অয়েলপেণ্ট করা দেয়ালে বড় বড় আয়না ঝুলিতেছে, মেঝে কার্পেট-মোড়া, সোফা, ইজি চেয়ার, কৌচ, গদীমোড়া কেদারা, ফরাস বিছানা, মার্ব্বেল ও চীনামাটির পুতুল, বড় বড় অয়েল পেণ্টিং, বৈদ্যুতিক ফ্যান লাইট—বড়লোকের বৈঠকখানার কোন

আসবাবের ত্রুটি ছিল না।

ভূতনাথ সম্মুখের দেয়ালজোড়া আয়নায় একবার নিজের মূর্ত্তিখানা দেখিয়া লইল,—বাঃ বেশ মানাইয়াছে, মাথায় একটা টিকি থাকিলেই একবারে পুরা ভাটপাড়ার ভটচায্! ওঃ বামুনের নামাবলিখানা কি কাজেই লাগিয়া গিয়াছে!

হঠাৎ ভূতনাথ চমকিয়া উঠিয়া প্রায় সোফা হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল,—তাহার পশ্চাতে বীণার মত মধুর ঝঙ্কারে কে বলিল, "বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুর! মাতাইব ধরা সুরা আনি—"

মুহূর্ত্তে চারি চক্ষুর মিলন। ভূতনাথ দেখিল—যাহা জীবনে কখনও দেখে নাই, অপরূপ রূপময়ী অনবদ্যাঙ্গী কিশোরী। ভূতনাথের সংস্কৃত বিদ্যা জানা থাকিলে বলিত,—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি! কবির বর্ণনা, এ যে তাহার সাকার বিগ্রহ! এতরূপ নারীর হয়? সুন্দরীর আয়ত নীলোৎপল নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত, কমলদলতুল্য চরণ কক্ষমধ্যে প্রসারিত, অন্য চরণ কক্ষের বাহিরে ন্যস্ত—কিশোরী ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় অবস্থান করিয়া তাহারই দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। সে কক্ষমধ্যে যেন চঞ্চলা চপলার মত রূপের ঝলক ছড়াইয়া দিয়া নিমিষে চপলা-চমকেরই মত ভূতনাথের চক্ষু ঝলসিত করিয়া অন্তর্ধান করিল—ভূতনাথ বিস্ময়ে বাক্‌রহিত হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষণপরে ভৃত্য আসিয়া বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল, সে একবার ভূতনাথের দিকে চাহিল। "কে ঠাকুরমশাই, পেন্নাম" বলিয়া সে চলিয়া গেল। সে কেন, কাহার জন্য, বসিয়া আছে, এযাবৎ কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। সেও একটা মতলব আঁটিয়া কাহাকেও

দামী পাথর আঁটা। ভূতনাথের পা দুইটিতে কণ্ডুয়ন আরম্ভ হইল। কদম্বের যেমন বর্ষার জল পাইলে শিহরণ হয়, চোরাই মাল জয় করিলে তেমনই ভূতনাথের চরণ যুগলে নৃত্য শিহরণ জাগিয়া উঠিত। বাঁচিয়া থাকুক নামাবলি! তাহার কল্যাণে আজ তাহার ঘটি, রেশমী চাদর, রেশমী জামা, সোণার বোতাম। না, নামাবলি বাঁচিবে কেন, বাঁচিয়া থাকুক পিসী! পিসী যদি তাড়াইয়া না দিত, তবে ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাওয়া হইত না, গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে না গেলেও ত বামুনের লোটা নামাবলি না বলিয়া ধরা দিত না, আর নামাবলি না পাইলেও ত চাদর জামা সোনা জহরৎ বগলে চাপা দিবার সুবিধা হইত না। অতএব থ্রি চিয়ার্স ফর পিসীমা! হিপ হিপ হুররে! হায় হায় এমন পিসীকেও কাঁদাইয়া বেড়াইতেছে ভূতনাথ—তাহার সোল এয়ার এপেরেণ্ট—ভাঙ্গা বাড়ীর ভবিষৎ মালিক! ধিক!

ভূতনাথ দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। পাড়ায় প্রবেশ করিয়াই সে প্রথমে নকুড় স্বর্ণকারের দোকানে দর্শন দিল।

নকুড়ের সহিত চুপি চুপি পরামর্শ করিয়া দুই একবার মাথা নাড়া-নাড়ির পর ভূতনাথ নগদ ২৫টি রজত মুদ্রা ট্যাকে গুঁজিয়া জিনিষগুলি রাখিয়া চলিয়া গেল। নকুড়ের সহিত ভূতনাথের এই কারবার নূতন নহে। নকুড় জানিত, যাহা তাহার সিন্দুকে একবার বন্ধকরূপে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার আর বহির্গমনের উপায় থাকিবে না।

ভূতনাথ মহা উল্লাসে পিসীর ভাঙ্গা ঘরের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "পিসী! পিসী!" পিসী ভাড়াটে বাবুদের ঘরে বসিয়া কাঁথা সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্বশুর কুলের ধনদৌলতের গল্প করিতেছিলেন। ভূতনাথের ডাকে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, তাঁহার ভূতো আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। একবারে আলুথালু হইয়া

ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া তিনি প্রায় কান্নার সুরে ফুঁপাইয়া উঠিলেন, "কেরে, আমার ভূতো কি ফিরে এলি ?"

তখন পিতৃস্বসা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের যে মিলন হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার নহে। কিছুক্ষণ একপক্ষে কান্নার প্যাসিফিক ওসান ও অপর পক্ষে তাহার ভান বহিবার পর পিসী যখন শুনিলেন, তাঁহার ভূতোর চাকুরী হইয়াছে এবং ভূতো যখন আগাম ২৲ টাকা ( পাওনার করকরে টাকা ) দেখাইয়া তাঁহাকে হকচকাইয়া দিল, তখন তিনি তাহার মাথাটা কোলে টানিয়া লইয়া মাথায় চুমা খাইয়া অশ্রুসজল নয়নে বলিলেন, "বেঁচে থাক্, রাজা হ'ও, আমার মাথার চুলের মত তোর পেরমায়ু হোক্। বেটাবেটিরা বলে কিনা আমার ভূতো বওয়াটে, চোখখাগীরা বলে কি না আমার ভূতো গাঁজা টানে ! আমার ভূতো কিনা তেমনই ছেলে। হাঁ বাবা, তোর যে একখানা নেখন এয়েছে, দু'দিন পড়ে রয়েছে, দেখ দিকি সরির ওখান থেকে এলো কিনা। আগে কিছু খা বাবা। আমি চট করে দু'মুটো চাল চাপিয়ে আসি তোর জন্যে।"

পিসী পত্র আনিয়া দিলেন। ভূতো মুড়ী ও নারিকেল নাড়ুর সদ্ব্যবহার করিতে করিতে পত্র পাঠ করিল। পত্র মিরাট হইতেই আসিয়াছে, তাহার জ্যেষ্ঠ ভগিনী সরলাই লিখিয়াছে বটে। মিরাটের রমানাথ বাবু জরুরী কাজে কলিকাতায় যাইতেছেন, বোধ হয় এই সপ্তাহেই কলিকাতায় পৌঁছিবেন। তাঁহার একটি ডাগর মেয়ে আছে। রমানাথবাবু কায়স্থ, ভূতনাথদেরই পালটিঘর ; তাঁহার কিছু টাকা-কড়িও আছে, ভূতনাথের জামাই বাবুর আফিসে মোটা মাহিনার চাকুরী করেন। তিনি কলিকাতায় গিয়া ভূতনাথকে দেখিয়া আসিবেন, পছন্দ হইলে তাঁহার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবেন। মেয়ে গেরস্থর ঘরের পাঁচপাঁচি মেয়ের মত, কিছু গয়না গাঁটিও পাবে বাপের কাছে, আর

ভূতনাথকেও তিনি দিবেন থুবেন মন্দ নয়। সে যেন লক্ষ্মী ছেলের মত তাঁহাকে দেখা দেয় এবং বেশ শিষ্ট ভাবে কথাবার্ত্তা কয়। তাহা হইলে শ্বশুর তাহার একটা বড় চাকরীও করিয়া দিবেন। সম্ভবতঃ দুই এক সপ্তাহের মধ্যে একদিন সকালে তিনি তাহাদের বাড়ী গিয়া ভূতনাথকে দেখিয়া আসিবেন। লক্ষ্মীটি, ভাইটি, সে যেন সপ্তাহ দুই সকালে বাড়ী থাকে।

চিঠিতে কনের কথা পড়িয়াই ভূতনাথের, মোহিতের বাড়ীর সেই ডাগর্ ডাগর্ ভাসা চোখ দুটি আর গোলাপের মত ফুটফুটে মুখখানি মনে পড়িল। কোথায় সেই পরীরাজ্যের অপ্সরী, আর কোথায় রমানাথের পাঁচাপাঁচি! ভূতনাথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। কিন্তু আকাশের চাঁদ হাতে ধরার আশায় বসিয়া থাকার অপেক্ষা মাটির পাঁচাপাঁচির সঙ্গে নগদ টাকা, গয়নাগাঁটি আর আফিষে চাকুরী নিশ্চয়ই ভাল। ভূতনাথ স্থির করিল, সে ভাল মানুষটির মত এই দুই সপ্তাহ সকালে বাড়ীতেই কনের বাপের জন্য অপেক্ষা করিবে।

( ৫ )

পরদিন সন্ধ্যার পর ভূতনাথ ডেঁপো হরির আখড়া ঘরে বসিয়া চরসের কলিকায় টান দিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের ভাড়াটিয়া বাবুর পুত্র সুশীল আসিয়া বলিল, একজন বাবু তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার মস্ত মোটর গাড়ীর উপর তিনি বসিয়া আছেন। ভূতনাথ চমকিত হইল, তাহার বাড়ী মোটর গাড়ী? কে এ ভদ্রলোক? মিরাটের কনের বাবা রমানাথ ভাড়াটে মোটরে আসিল নাকি? না, সে ত সকালে আসিবে বলিয়াছে।

ভূতনাথ হাত মুখ ধুইয়া বাড়ীর দিকে চলিল, কে গাড়ীতে বসিয়া আছে, দূর হইতে বুঝিতে পারিল না। একটু নিকটে গিয়া গাড়ীতে

বেরুতে আরম্ভ করবি—পুরুতমশাই বলছিলেন, মঙ্গলে উষা বুধে পা ভাল। হাঁ, ভাল কথা, বড় মজাই হয়েছে কাল।" বলিয়া মোহিত খুব এক চোট হাসিয়া লইল।

ভূতনাথ তাহার হাসি দেখিয়া শঙ্কিত হইল। এতক্ষণ তাহাকে দেখিয়া যে ভয়টা হইয়াছিল, তাহার কথা শুনিবার পর সে ভয়টা দূর হইয়াছিল। কিন্তু আবার হঠাৎ গত কল্যের মজার কথা বলে কি? ভূতনাথের বুকটা গুরু গুরু করিয়া উঠিল, গাড়ী থামাইতে বলিবে না কি! না, এক লম্ফে—

মোহিত কিন্তু সমান বলিয়া যাইতে লাগিল, "ওঃ সে যে রগড়, তোকে আর কি বোলবো ভাই। ঐ যে পুরুত মশাইয়ের ভাইপোর কথা বলছিলুম, খুড়ো না এলে আমাদের বাড়া পূজো করতে আসে, ওকে আমাদের বাড়ীর সবাই চেনে। কাল বিকেলে লতি আমায় খুঁজতে আমার দোতালায় বৈটকখানায় গিয়েছিল।" ভূতনাথ বলিল, "লতি কে?" মোহিত বলিল, "আমার বোন লতিরে। হাঁ, তারপর শোন। দোতালার বৈঠকখানায় নেহাৎ জানাশুনো লোক না হলে উঠতে পায় না, একথা সে জানত। বিশেষ আমি যে ঘরে ছিলুম না, তা সে জানতো না, আর বৈঠকখানায় কারও গলার সাড়াও সে পায় নি। তাই ভাবলে আমি হয়ত অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘরে পা দিয়েই দেখে সোফায় নামাবলি গায় দিয়ে পুরুতমশায়ের ভাইপো। শুনেছিল, কদিন চাকরীটার জন্যে হাঁটাহাঁটি করছে, তাই হয় ত আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওকে এরা সবাই বিষ্ণুপ্রিয়া' বলে ঠাট্টা করে। আমাদের বাড়ীতে পূজোয় একবার ওদের পাড়ার সখের থিয়েটার হয়েছিলো—ও তাতে চৈতন্যলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া সেজেছিল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করবার পর বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যকে ভয় দেখিয়ে রেগে গিয়ে বলে-

নামাবলি খানা দেখেছিলেন।”

ভূতনাথ বলিল, “এঁ্যা, পুরুতের নামাবলি? বল কি? বল কি? মহাপাতক।”

মোহিত বলিল,“তারপর আরও শোন্। আমার ঘর থেকে আমার সিল্কের চাদর জামা আর সোনার বোতামটাও উড়ে গেল! পুরুতমশাই শালার গায়ে সেই সিল্কের চাদরখানাও দেখেছিলেন ব'লে মনে হ'ল। বল্‌দিকি. শালাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া যায় কি না!”

ভূতনাথ বলিল, “পুলিশে দেওয়া? শালাকে পাঁশ পেড়ে কাটলেও রাগ যায় না। বল কি, বেটার বুকের পাটাখানা কি বল দিকি!”

মোহিত বলিল, “তবে চলনা, দু'জনে বিডন্ ষ্ট্রীটের থানায় যাই।”

মোহিত যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভূতনাথের মুখখানা আবার শুকাইয়া উঠিল। সে আমতা আমতা করিয়া কহিল “তুমিই যাও ভাই। আজ পিসীমার শরীরটে খারাপ হয়েছে, সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে।”

মোহিত বলিল, “তা যাচ্ছি বেটা পালাবে কোথায়? পুরুতমশাই তাকে বেশ করে চিনে রেখেছেন—মতিও তার হনুমানের মত মুখখানা ভুলবে না। কত ধানে কত চাল বাছাধনকে বোঝাচ্ছি আমি—যত টাকা লাগে, পুলিশকে দোবো। উঃ বেটা ঘর সন্ধানী, না হ'লে পুরুত-মশায়ের ভাইপো সেজে আমার বাড়ী উঠলো কি ক'রে? কি বলিস?”

ভূতনাথ দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিল, “ঘরসন্ধানী ব'লে ঘরসন্ধানী! তা ভাই আগে যাই।”

মোহিত বলিল, “এই নে একটা টাকা. গাড়ী ক'রে বাড়ী যাস, আমি কিডষ্ট্রীটটা হয়ে যাব। আর দেখ, কাল সকালে বাড়ী থাকিস, আমার ইঞ্জিনিয়ারের সরকার মশাই তোর সঙ্গে দেখা ক'রে কাজটা

"করবার আর জায়গা পাওনি বাপু ? উঠে পড় ত এখান থেকে।"

বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বলেন কি আপনি ? আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন ? এলুম দিল্লী ডিল্লী হয়ে এক মুল্লুক থেকে আর এক মুল্লুকে—

পিসীমা। আমার বকবার সময় নেই বাবু ! বসতে হয় বোসো, না বসতে হয়, চলে যাও, আমি চানে চল্লুম। বলে—

বাবু। যাচ্ছেন যান, তবে সেকেলে গিন্নীবান্নী মানুষ, মনে করেছিলুম, টোটকা টুটকী জানেন, ডাক্তার কবরেজে কিছু করতে পারলে না, তা যদি—

পিসীমা। ওমা, অসুখ হয়েছে ? কি অসুখ বাছা ?

বাবু। অসুখ ব'লে অসুখ ! আহার নাই নিদ্রে নেই, কেবল গা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে—

পিসীমা। ওমা, তা এতক্ষণ বল নি ! তা ঐ গিয়ে ধরনা কেন, হিঙ্কে শাগের রস আধতোলা, মধু—

বাবু। ওসব ঢের করা হয়েছে, তেতো মুখে রোচে না, খেলেই বমি।

পিসীমা। বমি ? তা একটু ক'রে পলতার ঝোল কিংবা নিম বেগুন—

বাবু। ও সবই সমান, কিছু পেটে তলায় না।

পিসীমা। তবে উল্টো তিকিচ্ছে—গুগুলির ঝোল, গুগলির জল, গুগলির চচ্চড়ি। বলে, সারে না ! সেবার হিমির বড় জায়ের সেজ ভায়ের মেজ মেয়ের ছোট নন্দের কোলের ছেলেটার ঘুংরি কাসি হয়েছিল,—কোলে চেপে ধ'রে আড়ুলে তেল মাখিয়ে গলায় সেঁধিয়ে টেনে তুল্লুম এক দলা কাস ! বস্, ছেলে হাপ ছেড়ে বাঁচলো। রোগ আবার সারে না !

বাবু পিসীমার কথার বানে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া ছিলেন,

তাই বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া শুনিয়াই যাইতেছিলেন। এখন অবসর পাইয়া বলিলেন,—

"আপনি কার রোগের কথা ভাবছিলেন ?"

পিসীমা। তুমি কার রোগের কথা বলছিলে বাপু ?

বাবু। সেটা বলিনি আগে ? ওষুধ ত বাৎলাচ্ছিলেন অনেক—

পিসীমা। তা ব'লে দোবো না ? বলে—

বাবু। ওষুধ কি আমার জন্যে ব'লে দিচ্ছিলেন ?

পিসীমা। না ত কি আমার জন্যে ? তুমি কার রোগের কথা বলছিলে ?

বাবু। রূপোর জন্যে ?

পিসীমা। তা রূপোই হোক আর সোণাই হোক, ওষুধ ভাগর মানুষদের একই।

বাবু। আজ্ঞে, রূপো! রূপো! রূপো ভাগর ছেড়ে খাটো মানুষও নয় যে!

পিসীমা। তা না হোক মাঝারি মানুষ হ'লেও চলে।

বাবু। আরে বলছি, মানুষই নয়—

পিসীমা। তবে কি ? মেয়ে মানুষ ?

বাবু। আরে না, না, রূপো আমার মটরু বাঁদর—ঐ যাকে রেলভাড়া দিয়ে এক মুলুক থেকে—

পিসীমা। মর, মর, হতচ্ছাড়া মিনসে! যাচ্ছি শুভকর্ম্মে—

পিসীমা রাগে রাগে গরগর করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "বলি শুনুন, শুনুন—"

পিসীমা দূর হইতে বলিলেন, "দূর, দূর"

বাবু মন মরা হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি নাছাড়বান্দা,

ভূত। মিরাটের হাজারী সরকার ?

ভদ্রলোক তখন জুতা পরিধান করিতেছিলেন। লাঠিটা লইয়া প্রস্থান করিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হাঁহে ছোকরা—সে-ই ত আমায় বলে দিয়েছিল কলকাতায় এসে তোমায় দেখে যেতে; আমার মেয়ের বিবাহের চেষ্টা করছি কি না,—"

ভূতনাথ আর নাই! এ্যা, ইনি তাহা হইলে সরকার টরকার নহে, মিরাটের কনের বাপ! কি সর্ব্বনাশ!

হাতে হাত কচলাইতে কচলাইতে ভূতনাথ মিনতির সুরে বলিল, "আপনি, আপনি রমানাথ বাবু?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "লোকে ত বলে তাই। হাজারী সরকার ছেলে দেখালে ভাল। তা এখন যাই, তুমি বাবু পিসীর আচল-জোড়া হয়ে বেঁচে থাক, আমার কোন আপত্তি নাই। যেমন পিসী, তেমনই ছেলে!"

রমানাথ বাবু দুইপদ অগ্রসর হইলেন। ভূতনাথ কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া রহিল। মোহিতের বাড়ীর বিদ্যুতের আলোক তাহার অদৃষ্টে ত জুটিতই না, মাঝে হইতে গৃহস্থ রমানাথের প্রদীপের আলোকও তাহার ফস্কাইয়া গেল। হায় পিসী!

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

# —কয়াসা-প্রভাত—

অভ্র আভা রূপ্‌লী চাদর
কে দিলরে পরিয়ে তোরে ?
ও বন, তোমায় কাহার আদর
সাজিয়ে দিল এমন ক'রে ?
পাতায় পাতায় মুক্তা আঁকা
স্বচ্ছ বসন মাণিক মাখা
নগ্ন তনুর অমল শোভা
উথ্‌লে ওঠে ভুবন ভ'রে।
অভ্র আভা রূপ্‌লী চাদর
কে দিলরে পরিয়ে তোরে ?

কোন বিরাগে, নয়ন আগে
ওড়্‌না ওড়াও মুখটী ছেয়ে
কার অনুরাগ, ও বন-ভাগ
ক'র্‌লে তোমায় দুষ্টু মেয়ে ?
তাই কুয়াশার আব্‌ছায়াতে
দিন করো রাত কোন মায়াতে
সরম ভ'রে গোপন্‌ র'য়ে
ওই উঁকিতে দেখ্‌ছ চেয়ে।
কোন বিরাগে, নয়ন আগে
ওড়্‌না ওড়াও মুখটী ছেয়ে ?

শ্রীলীলা দেবী।

# -অশ্রুজলের পদ্ম—

*
*  *

কিছু দিন ধরে' অজীর্ণ রোগে ভুগে' অনন্ত বাবুর শরীর ক্রমশঃই খারাপ হয়ে আসছিল। প্রৌঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়ে এলেও এতদিন তাঁর শরীর বেশ ভালই ছিল; কিন্তু যেদিন থেকে তাঁর স্ত্রী, স্বামী ও একমাত্র মেয়ে সুজাতাকে রেখে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে অজ্ঞাত লোকে প্রস্থান করলেন, সেদিন থেকে তাঁর শরীরের ওপর যেন শনির দৃষ্টি পড়ল। প্রথম কিছুদিন শুধু জ্বর, পরে সর্দ্দি কাসী ও বুকজ্বলা সুরু হয়ে' ক্রমে তা' অজীর্ণ রোগে পর্য্যবসিত হ'ল। অনন্ত বাবুর সুস্থ ও সবল দেহ শীর্ণ ও নত হয়ে' পড়ল; কাঁচা সোনার মত গায়ের রং ঝরা পাতার মত কালো হয়ে এল, বুদ্ধির আভায় প্রদীপ্ত চোখ দুটি ভোর বেলার চাঁদের মতই হয়ে এল দীপ্তিহীন, ম্লান।

ডাক্তারেরা বায়ু পরিবর্ত্তন করবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। যাই যাই করেও কিন্তু অনন্ত বাবুর যাওয়া আর ঘটছিল না। এর কারণ —পয়সা তাঁর অগাধ থাকলেও বিলাসী তিনি ছিলেন না মোটেই এবং বিলাসীদের মত সুস্থ ও অসুস্থ, উভয়াবস্থাতেই হাওয়া পরিবর্ত্তন করে' তাঁর জীবন কাটেনি। আর এই কারণেই হাওয়া পরিবর্ত্তনের উপযোগী স্থান গুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ই ছিল না। তাই কোথায় যে যাবেন—এই নিয়েই তিনি মুস্কিলে পড়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিষয় সম্পত্তি দেখবার কি ব্যবস্থা করা যায়—এও একটা মুস্কিল হয়ে

পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প যে তিনটি সমস্যার জন্যে কার্য্যে পরিণত হ'তে পার ছিল না—সেই সমস্যা এয়ের প্রধানটিরই সমাধান হ'য়ে যাওয়ায় তিনি যেন বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করতে লাগলেন। মুখে বার কতক—আমার এ শরীর গেলেই বা কি থাকলেই বা কি, বললেও তৃপ্তির আভায় যে তাঁর রোগ-শীর্ণ মুখখানি জ্বল্ জ্বল্ করছিল, পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে একথা বুঝতে সুজাতার এক্‌টুও দেরী হ'ল না।

অনন্ত বাবুর অবিন্যস্ত চুলগুলি হাত দিয়ে ঠিক করে' দিতে দিতে সে বল্‌লে, তা' হ'লে কালই ডাক্তার বাবুকে বল্‌বো বাবা। দেখি উনি কোথায় যেতে বলেন।

সূর্য্য অস্ত গেছে; সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আস্‌ছিল। সুজাতা বারান্দা থেকে অনন্তবাবুকে নিয়ে গিয়ে ঘরে শুইয়ে দিলে। অন্যদিন এম্‌নি সময় রুগ্ন পিতার কাছে বসে' বই পড়া কিম্বা গান শোনানো সুজাতার নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তার বন্ধুদের অনেকগুলি চিঠি অনেক দিন হ'ল এসে পড়ে' রয়েছে; সময়াভাবে সেগুলির জবাব দেওয়া হয় নি। চিঠি গুলোর যেমন করেই হোক আজই জবাব লিখে' ফেল্‌বে, এই সঙ্কল্প করে' সুজাতা তার পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

সুজাতা অনেকদিন এ ঘরে আসেনি.....ধূলো আর জঞ্জালে ঘরটা ভরে' গেছে; টেবিলের বইগুলো এলো মেলো হ'য়ে পড়ে আছে; ছবি গুলোর ওপর মাকড়সা জাল বুনেছে। অনেক দিন পরিষ্কার না কর্‌লে ঘরের যেমন রূপ হয়ে থাকে—তেমনি। একদিনে ঘরটি পরিষ্কার করে' ফেলা অসম্ভব মনে হ'লেও সুজাতা দম্‌ল না। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, এলানো চুল গুলিতে একটা এলো খোঁপা বেঁধে সে ঘর পরিষ্কার কর্‌তে সুরু করে' দিলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরটা বেশ

খানিকটা সাফ হ'য়ে গেল। টেবিলের ওপর ছড়ানো বই গুলি তাদের যথা নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলে; সেল্‌ফ এর ধূলো পড়া মলিন বই গুলি চক্ চক্ করে' উঠল; ছবির ওপর থেকে ঘর সংসার তুলে মাকড়সার দলও ধীরে বিদায় নিলে। এতক্ষণ ঘরটাকে এক জরা-গ্রস্থ বৃদ্ধের মত কদাকার লাগছিল, এখন মনে হতে লাগল এ যেন বিচিত্রবরণা এক ষোড়শী তরুণী।

ঝাড়া পোঁছা করতে করতে সুজাতা শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। তার ছোট্ট কপালটি মুক্তা বিন্দুর মত শুভ্র ঘর্ম্ম বিন্দুতে ভরে' উঠেছিল। একটু খানি বিশ্রাম নেবার সঙ্কল্প করে' তাই সে পশ্চিম ধারের জান্‌লার পাশে এসে দাঁড়ালো...জান্‌লায় দাঁড়াতেই স্নেহময়ী মাতার মত বাতাস এসে তার সর্ব্বাঙ্গ চুম্বন করতে লাগলো। আরাম বোধ করে' মাথার চুলগুলি এলিয়ে দিয়ে অলস দৃষ্টি মেলে সুজাতা রাস্তার দিকে তাকালো। কখন নিঃশব্দে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। জলে-ভেজা পিচ-মোড়া রাস্তা গ্যাসের আলোয় চক্ চক্ করছে। আকাশে চাঁদ নেই, ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘে সারা আকাশ ভরা। অদূরে একটা সুউচ্চ নারকোল গাছ অন্ধকারে দৈত্যের মত আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

সুজাতা তন্ময় হ'য়ে বাইরের এই আলো-ছায়াময় রূপটি দেখতে লাগলো। কখন সে তার ঘরের দরজায় অনন্তবাবুর বন্ধু পুত্র শৈবাল এসে দাঁড়িয়েছে তা' সে জান্‌তেও পারে নি। শৈবালের মেকী কাসীর শব্দে মুখ ফিরিয়ে সুজাতা তাকে দেখতে পেলে। শৈবাল তাদের প্রতিবেশী। অনন্ত বাবুর বন্ধু পুত্র হিসেবে এ বাড়ীতে তার অবাধ গতি। দিনান্তে এক বারও এ বাড়ীতে আসা ছিল তার নিত্য কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধী ধারী হলেও শৈবাল মোটেই

শৈবালের মনে হল যাকে দেখে কবির লেখনী থেকে এই কথাটি বেরিয়ে এসেছিল, সেই বুঝি তার সাম্‌নে মূর্ত্তিমতী হয়ে এসে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর বইটা ফেলে শৈবাল বল্‌লে, আসুন, অনন্ত বাবু আজ কেমন আছেন ?

সদ্য ফোটা কতকগুলি গোলাপ ফুল কিছুক্ষণ আগে মালী ঘরে রেখে গিয়েছিল। ফুলগুলি একটা জাপানী ফুলদানীতে সাজাতে সাজাতে সুজাতা বললে,—সেই একই রকম। ডাক্তার বাবু বল্‌ছিলেন চেঞ্জে না গেলে এর আর উপশম হবে না। আমরা বোধ হয় শীঘ্রই চেঞ্জে যাব।

শৈবাল বল্‌লে—কবে ? আমি তো কিছু শুনিনি।

সুজাতা বল্‌লে,—কবে তা' এখনো ঠিক হয়নি তবে শীঘ্রই।

পাশের ঘরে অনন্তবাবুর গলা খাঁকারির শব্দ পেয়ে সে সচকিত হ'য়ে বল্‌লে'—বাবা উঠেছেন। আপনি কি বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন ?

নাঃ! রাত্রিতে আর ওঁকে বিরক্ত কর্‌ব না—আমি আজ আসি, নমস্কার! এই বলে শৈবাল উঠে দাঁড়াল। গান শোনা ও চা খাওয়া দুটোর কোনটাই না মেলায় এবং এত সত্বর সুজাতা তাকে বিদায়ের ইঙ্গিত করায় তার মনটা অপ্রসন্নতায় ভরে' উঠেছিল। সিঁড়ী দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে সে মনে মনে বল্‌লে,—তোমার ও তোমার টাকার লোভেই আমার এ বাড়ীতে আসা। ও বুড়োকে দেখবার জন্যে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। কবে যে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর সুজাতা রাজ কুমারী লাভ কর্‌বো!

*
* *

ডাক্তারের পরামর্শ মত ঠিক হ'ল, অনন্তবাবু বায়ু পরিবর্ত্তন কর্‌তে দেওঘর যাবেন। জায়গাটা কল্‌কাতা থেকে বেশী দূরেও নয় অথচ স্বাস্থ্যপ্রদ। যাবার আয়োজন সুরু হল। অনন্তবাবুর চেয়েও সুজাতার উৎসাহ দেখা গেল অনেক বেশী। কারণ বাইরে যাবার সৌভাগ্য সুজাতার জীবনে' কখনো ঘটেনি। ধূম কলঙ্কিত কোলাহল-মুখরিত কল্‌কাতাতেই তার জীবনের উনিশটী বছর একাধিক্রমে কেটে এসেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার সৌভাগ্য বাস্তব জীবনে তার কখনো ঘটে উঠেনি। তাই Sweet is the lore which nature brings কথাটি কার্য্যে পরিণত করিতে তার আনন্দ ও উৎসাহের আর অন্ত রইল না।

সুজাতাদের দেওঘর যাওয়া স্থির শুনে শৈবাল অনন্তবাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এল। মাঝের ক'দিন সে আর আসেনি। সুজাতাকে স্ত্রী রূপে পাবার কল্পনা কর্‌লেও, অনন্ত বাবু ও সুজাতার দিক থেকে সে এমন কিছু আভাস পায়নি, যাতে তার কল্পনা সফল হতে পারে। তাই সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল এবং এ বাড়ীতে আসাও কমিয়ে দিয়েছিল অনেক। অথচ একেবারে না এসেও সে থাক্‌তে পার্‌তো না।... অর্দ্ধেক রাজত্ব ও সুজাতা রাজকুমারীর লোভ সে তখনো একেবারে ছাড়তে পারেনি।

বিছনার ওপর আধশোয়া অবস্থায় বসে' অনন্তবাবু হলকেনের একখানি বই পড়্‌ছিলেন। ইংরাজী উপন্যাস পড়া ছিল তাঁর বাতিক। এই অসুস্থ শরীরেও অনেক রাত পর্য্যন্ত তিনি উপন্যাস পড়্‌তেন। অবশ্য সুজাতার সাম্‌নে নয়; সে দেখ্‌তে পেলেই বই রেখে আলোটি

ছবির মত সুন্দর, এই বাড়ীটি দেখে সুজাতার ভারী পছন্দ হ'ল। দরোয়ান ও ভৃত্যের সাহায্যে সে তার ছোট্ট সংসারটী মোটামুটি রকম গুছিয়ে তুল্‌লে। পিতার শোবার ঘরটি সে ঠিক কর্‌লে রাস্তার ধারের ঘরটিতে হবে। এ ঘরে আলো হাওয়া র রাজত্ব, ফুলের গন্ধ এ ঘরে সর্ব্বদাই মাখানো। পাশের ছোট ঘরটি সুজাতা তার পাঠাগার কর্‌বার জন্যে মনোনীত করে নিলে। নতুন দেশে নতুন বাড়ীতে নতুন আব-হাওয়ার মধ্যে এসে পিতা পুত্রীর জীবন-ধারা সুখ-স্বপ্নের মতই উপভোগ্য হয়ে স্বচ্ছ গতিতে ব'য়ে চল্‌লো।

*

* *

পূর্ণিমার রাত। সারা পৃথিবীর ওপর নিঃশব্দে জ্যোৎস্নার প্লাবন বইছে। আকাশ নির্ম্মেঘ, নীলোজ্জ্বল; বাতাস সুরভি-স্নিগ্ধ; চারধার নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি মাঝে মাঝে সেই নিস্তব্ধতাকে সচকিত করে তুল্‌ছে।

অনন্তবাবু অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। সুজাতাও শয্যা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ঘুম না হওয়ায় ছাদের ওপর এসে সে পায়চারী কর্‌ছিল। বাতাসে মাঝে মাঝে তার মাথার চূর্ণ অলকগুলি মুখের ওপর এসে এসে পড়ছিল, চাঁদের আলোয় বাপের হীরক দুলটা ঝিক্ মিক্ করে উঠছিল। আনমনে সে পায়চারী করে' চলেছে।

হঠাৎ বেহালার উদাস-মধুর সুর-ঝঙ্কার কাণে আস্‌তে সুজাতা বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালো। সাম্‌নে শাদা রংয়ের ছোট্ট একটী বাড়ী —চাঁদের আলোয় শুভ্র স্বপ্নের মত দাঁড়িয়ে আছে। সুজাতার মনে হ'ল বেহালার সুরটা যেন সেই বাড়ী থেকেই ভেসে আস্‌ছে। বুঝি কোন বিরহী তরুণ বাজাচ্ছে! নইলে সুরের মীড়ে হাসি কান্নার এমন

একত্র সমাবেশ কেমন করে সম্ভব হবে। অতীতের মিলন-ঘন দিনগুলি স্মরণ করে বেহালার সুরে হাসির ঝরণার সঙ্গে বিরহের ব্যথা ম্লান দিনগুলির অশ্রুর ঝরণা বয়ে চলেছে।

দিনের আলোয় এই বাড়ীটি অনেকবার সুজাতার চোখে পড়েছে। বাড়ীটি তার ভারী ভাল লাগ্‌তো। সুজাতার কাছে এটা বাড়ী বলে মনে হ'ত না.....এ যেন নিপুণ চিত্র করের আঁকা একখানি ছবি—মাটীর ওপর দাঁড় করানো আছে।

অবসর পেলেই আপনার জানালায় দাঁড়িয়ে সুজাতা এই বাড়ীটির দিকে চেয়ে থাক্‌তো। জান্‌লা দর্‌জা বন্ধ দুধের মত সাদা রংয়ের এই বাড়ীটি তার কাছে এক্‌টা রহস্যময় জগৎ এর মতই ঠেক্‌তো। তার মনে হত বাড়ীটি যেন ঘুমের দেশের রাজকন্যার নীড়.....এর ভেতর রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে।

যাকে ভিত্তি করে' সুজাতা তার মনের মধ্যে এক্‌টা কল্পনা জগৎ তৈরী করেছিল হঠাৎ সেই বাড়ী থেকেই বেহালার ঝঙ্কার শুনে সে পরম বিস্ময় অনুভব কর্‌লে। দেওঘরে আসা থেকে আজ পর্য্যন্ত এ বাড়ী বন্ধই দেখে এসেছে; মনুষ্য বাসের কোন চিহ্নই তার চোখে পড়েনি। রাজকন্যার ঘুমন্ত নীড় রাজপুত্রের সোনার কাঠির ছোওয়ায় কখন আবার সম্বিৎ পেল—জান্‌বার জন্যে সে কৌতূহলী হয়ে উঠ্‌ল। বিশেষ চেষ্টা করে তার চোখ পড়ল বাড়ীর বন্ধ দরজা জান্‌লাগুলো সব খোলা আর মাঝে মাঝে ছোট ছেলের কলরব বাতাসে ভেসে আস্‌ছে। এ ছাড়া আর কিছু সে দেখ্‌তে কিংবা শুন্‌তে পেলে না।

বেহালা শুন্‌তে শুন্‌তে সুজাতা মনের মধ্যে কল্পনার জাল বুনে চল্‌লো। হয় তো কোন তরুণ কবি—চাঁদের আলোয় উদাস হয়ে বেহালা বাজাচ্ছে। হয় তো এক বিপত্নীক প্রৌঢ়—প্রেম-স্বর্গলোকে

অনেক বেলা হ'ল ; তবুও অনন্ত বাবু ফিরলেন না দেখে সুজাতার উদ্বেগ ক্রমে ভয়ে পরিণত হ'ল। দরোয়ানকে পিতার খোঁজে পাঠাবার সঙ্কল্প করে' সে যেই এগুতে যাবে, এমনি সময় পথের দিকে দিকে তার চোখ পড়ল। সরীসৃপের মত এঁকা বেঁকা পথটি দিগন্তে গিয়ে মিশিয়ে গেছে। অনেকদূরে অনন্ত বাবুকে আসতে দেখা গেল। তিনি একলা ন'ন—তাঁর সঙ্গে একটী তরুণ যুবক আসছে। সুজাতা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে যে, অনন্ত বাবু ঠিক স্বাভাবিকভাবে আসছেন না ...কেমন যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছেন আর সেই তরুণ যুবকটি তাঁকে ধরে আছে। সুজাতা ভীত ও বিস্মিত হ'য়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। হাতের বইখানি কখন যে নিঃশব্দে তৃণ-শয্যা গ্রহণ কর্‌লে তা' সে জান্‌তেও পারলে না। শরৎ-প্রভাতের মায়াময় রূপটী মুহূর্ত্তেই তার কাছে ঝরাফুলের মত ম্লান হয়ে এল।

অনন্ত বাবু যখন একেবারে বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছেছেন তখন তাঁর পায়ের দিকে সুজাতার নজর পড়ল। তাঁর বা পায়ে জুতো নেই এবং তা'তে একটা রুমাল বাঁধা ; রক্তে রুমালটী লাল হয়ে উঠেছে।

অপরিচিত তরুণ যুবকটী সুজাতাকে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ নারী কণ্ঠ-ধ্বনি শুনে সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। সুজাতা তখন পিতার দিকে চেয়ে ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন কর্‌ছিল, তোমার পায়ে কি হ'ল বাবা ?

তরুণ যুবকটি সুজাতার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যৌবনের সোণার কাঠির ছোঁওয়ায় মুকুলিত হয়ে ওঠা তরুণীর কমনীয় যৌবন-শ্রী দেখে তার যেন হঠাৎ নেশা ধরে' গেল।

আশঙ্কা ব্যাকুল হীরার মত জ্বল্‌জ্বলে চোখ, শিশির-সিক্ত পদ্মের মত স্নিগ্ধ পবিত্র মুখখানি, দাঁড়াবার সুন্দর ভঙ্গী, নিঃশ্বাস পতনের তালে তালে দুলে'-ওঠা পরণের নীলাম্বরী শাড়ীখানির শিহরণ দেখতে দেখতে

সে একেবারে তণ্ময় হয়ে পড়্ল। তার এই ক্ষণিক তণ্ময়তা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল অনন্তবাবুর কথার শব্দে। অনন্তবাবু তখন সুজাতাকে বল্‌ছিলেন —আজ বড্ড বেঁচে গেছি মা। অন্ধকারে ভাল দেখ্‌তে পাইনি একখানা পাথরে পা আট্‌কে যাওয়ায় হুমড়ী খেয়ে একেবারে পড়ে গেছলুম। ভাগ্যিস্ ইনি ছিলেন; নইলে হয়তো অজ্ঞান হ'য়ে পড়েই থাক্‌তে হ'ত। এই বলে যুবকটির হাতে অল্প চাপ দিয়ে বল্‌লেন,—এই আমার বাড়ী; চলুন—ভিতরে চলুন; আপনি না থাক্‌লে আজ আমার কি হ'ত কে জানে। অনন্তবাবু যুবকটির হাত ধরে' বাড়ীতে নিয়ে আস্‌তে লাগলেন আর সুজাতা কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে তা'কে অভ্যর্থনা কর্‌তে লাগ্‌লো। এতক্ষণ যুবকটিকে সুজাতা ভাল করে' লক্ষ্য করেনি—পিতাকে নিয়েই সে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল। এতক্ষণ পরে যুবকটিকে দেখে তার ভারী ভাল লাগ্‌লো। লম্বা ফর্সা তরুণ যুবা; বয়স তেইস কিম্বা চব্বিশের বেশী হবে না! মাথায় ধোঁয়ার মত স্নিগ্ধ কালো দীর্ঘ চুল; মুখ-শ্রী তরুণীর আননের মত লাবণ্যমণ্ডিত। পায়ে তার বার্ম্মিস চটী, গায়ে একটা গেরুয়া রংয়ের খদ্দরের পাঞ্জাবী। আড়ম্বর-হীন সরল বেশভূষা—কিন্তু এতেই তা'কে ভারী চমৎকার মানিয়েছে। চোখ দু'টী যেন কোন স্বপ্নের আভায় জল্ জল্ কর্‌ছে।

অনন্তবাবু যন্ত্রণা অনুভব করে দাঁড়াতেও পাচ্ছেন না এবং যুবকটিকে ছেড়েও দিতে পার্‌ছেন না...তাঁর এই উভয় শঙ্কট লক্ষ্য করে' সুজাতা এগিয়ে গিয়ে পিতার হাত ধরলে। সুজাতার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে অনন্তবাবু বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন ও সুজাতা ও অনন্তবাবুর যুক্ত আহ্বানে যুবকটি ধীরে তাদের অনুসরণ করে'চল্‌লো। কেবলমাত্র আহত অনন্তবাবুকে বাড়ী পৌঁছে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে এলেও যুবকের সঙ্কল্প অটুট রইল না। অনন্তবাবুর সাদর আহ্বান প্রত্যাখান করে' বাড়ীর সাম্‌নে

গুণও সুন্দর—সে চমৎকার কবিতা লিখ্‌তে পারে আর বেহালা ও বাঁশী বাজাতে সে সিদ্ধ হস্ত—তখন অনন্ত বাবু তার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়্‌লেন; আর সুজাতার মনো-মন্দিরে তার উদ্দেশে একটী শ্রদ্ধার ফুল চির তরে নিবেদিত হ'য়ে গেল।

আবার বিকেলে আস্‌বার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিশলয় বাড়ী ফির্‌লো। সাম্‌নেই বাড়ী···ফির্‌তে দু' মিনিটও লাগে না। অকারণ সুখে কিশলয়ের বুক ভরে উঠেছিল, তখনি বাড়ী ফির্‌তে তার ইচ্ছা হ'ল না। গুন্ গুন্ করে' একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নদীর দিকে সে পা চালিয়ে দিলে। নদীর তীরে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে যখন সে বাড়ী ফির্‌ল...ফুলের মত কোমল রোদ তখন আগুনের মত প্রখর হয়ে উঠেছে এবং তার ফির্‌তে এত বেলা হচ্ছে দেখে তার দাদা ও বৌদি উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা কর্‌ছেন।

*

* *

কলেজে Straight Forword বলে' কিশলয় নাম কিনেছিল। কোন কিছু চাঁদা আদায় কিংবা ছুটীর দরখাস্ত নিয়ে প্রিন্সিপ্যালের কাছে যাওয়া, এ সব বিষয়ে সে ছিল অগ্রণী। প্রফেসর্‌রা তাকে ভাল বাস্‌তো, সতীর্থরা তা'কে শ্রদ্ধা করতো; বিনিময়ে তাঁর মধুর ব্যবহার সবাইকে তৃপ্তি দিত। ধনীর ছেলে হলেও দাম্ভিকতা ছিল কিশলয়ের সম্পূর্ণ অজানা; সবার সঙ্গে সমান হয়ে মেশবার ক্ষমতা ছিল তার অদ্ভুত।

পিতামাতাকে কিশলয় বিশোর বয়সেই হারিয়েছিল কিন্তু দাদা ও বৌদির স্নেহ যত্নে পিতামাতার অভাব অনুভব কর্‌বার তার সুযোগই ঘটেনি।

অন্যবারের মত এবারেও ইষ্টারের ছুটীতে দেওঘর আসা কিশলয়দের বাদ গেল না। দাদা বৌদি ভাইঝি বেণু আর একরাশ ইংরাজি বাংলা নভেল্ নিয়ে, কলেজ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিশলয় দেওঘরে এসে হাজির হ'ল।

কিশলয় ছিল কবি। নামেই নয়, সত্যিই সে ভাল কবিতা লিখতে পার্‌তো। কল্‌কাতায় তার লেখা বেশী এগুতো না; তার উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি সে দেওঘরে বসেই লিখেছে। ছবির মত সুন্দর শঙ্খ-ধবল দেওঘরের এই ছোট্ট বাড়ীটীতে এলে পর—কল্পনা রাণীর কৃপা-রসে তার দেহ মন অভিষিক্ত হয়ে উঠ্‌ত। তাই কোলা-হল-মুখরিত ধূম-কলঙ্কিত কল্‌কাতা ছেড়ে অবসর পেলেই দেওঘরে আসবার জন্যে তার মন উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা কর্‌ত।

দেওঘরে এসে কিশলয় অতি প্রত্যূষে প্রাতর্ভ্রমণ করে। এবারে এসেও সে প্রাতর্ভ্রমণ ছাড়লে না। সকালের আলো ভাল করে ফোটেনি, পাখীদের ঘুম ভাঙেনি, আকাশের বুকে তারার বাতি জ্বালানো···এম্‌নি সময় সে বেড়াতে বার হ'ল। সরীসৃপের মত এঁকা বেকা পথগুলো চার্‌দিকে ছড়ানো...তার-ই একটা পথ ধরে' কিশলয় নদীর দিকে এগিয়ে চল্‌ল। অন্ধকার ভাল করে' কেটে না যাওয়ায় পথঘাট ভাল দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীরে পৌঁছিয়ে কিশলয় দেখ্‌লে অত ভোরেও এক প্রৌঢ় নদীর তীরে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। একেবারে নদীর শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে কিশলয় এগিয়ে চল্‌ল। হঠাৎ এক অস্ফুট আর্ত্তনাদের ধ্বনি কাণে আস্‌তে সে বিস্মিত হয়ে পিছন ফিরে তাকালো। নদীর অসমতল তট-ভূমিতে বড় বড় অনেক পাথর পড়ে আছে। অন্ধকারে একটা পাথরে পা আট্‌কে গিয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পড়ে গেছেন এবং

হাতে নিয়ে কিশলয় বাড়ীর সাম্‌নের Compoundএ এসে বস্‌ল। পড়্‌বার ইচ্ছা নিয়ে এলেও পড়্‌তে ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না। তাই হাতে-রাখা মোড়া বই মোড়াই রয়ে গেল; দুপুরের তীব্র রৌদ্র রঞ্জিত গাছ পালার শিহরণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে নানা কথা ভাব্‌তে লাগলো।

তারা ব্রাহ্ম অনন্তবাবুরা ব্রাহ্মণ। উভয় পরিবারের মধ্যে যে কোন রকম লৌকিক ক্রীয়া চল্‌তে পারে না এ কথা যে কিশলয় জান্‌তো না তা নয় তবুও অনন্তবাবুর কাছে সে সুজাতাকে বিবাহ কর্‌বার প্রস্তাব করেছিল। তার ধারণা ছিল যিনি মেয়েকে এত বয়স পর্য্যন্তও অবিবাহিতা রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন তার মন বোধ হয় তুচ্ছ জাতির পাঁতির মোহে আর সংস্কারগ্রস্থ হয়ে নেই। উপযুক্তা কন্যার যে একটা দাবী আছে একথা তিনি বোধ হয় নিশ্চয়ই মানবেন। তাই সুজাতার সম্মতি নিয়ে কিশলয় অনন্তবাবুর কাছে সুজাতাকে বিবাহ কর্‌বার প্রস্তাব করেছিল। অনন্তবাবু মনের মধ্যে যে একেবারে গোঁড়া ব্রাহ্মণ—এ কথা তার জানা ছিল না। তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হ'ল; কিশলয়ের তরুণ জীবনের প্রথম প্রেম-নিবেদন পালা সুরুর প্রথমেই আহত হয়ে ফিরে এল।

কিশলয় তন্ময় হয়ে এই সব কথাই ভাবছে এমনি সময় তার বৌদি প্রীতিকা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেন। কিশলয়ের চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—চিত্রাকে বিয়ে করবার জন্তে যখন সাধলুম তখন কি না বাবুর বলা হ'ল এখন বিয়ে কর্‌বো না। তিনমাস পরেই এম্‌নি হ'ল যে বাবু একেবারে বিয়ে কর্‌বার জন্তে ক্ষেপে উঠলেন। বাঃ বাঃ ঠাকুর পো বাঃ!

কিশলয় একটু গম্ভীর হয়ে বললে,—কেন আমি কি বলিনি মনের

বাহির আমার পিছন হ'ল কাহার চোখের জলে।
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যতই চলে।
পার হ'তে চাই মরণ নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি,
আমায়——ওগো বে-দরদী
ফেলিলে কোন ফাঁদে ॥ *

এক টুক্‌রো কালো মেঘে চাঁদের আলো বন্দী হয়ে যেতে সারা' পৃথিবীর ওপর এক্‌টা ম্লান ছায়া ছড়িয়ে পড়্‌ল; বাতাস একটু শীতল হ'য়ে এল। বেহালা বাজ্‌তে লাগ্‌ল আর ছাদের আলিসায় দু' হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে সুজাতার চোখে অবিশ্রান্ত অশ্রু-ধারা বয়ে চল্‌লো।

শ্রীঅমিয়কুমার [redacted]

* এই গানটি কবি নজ্‌রুল ইস্‌লাম রচিত।

# -শরতের গান-

এই শঙ্খ-ধবল আলোর রেখা
শরত-আকাশে
হৃদয়-ডালি সাজায়ে দেয়
বকুল-পলাশে।

এই শুভ্র-অমল রবির কিরণ
মেঘের গায়ে গলায় হিরণ
অলোক লোকের বারতা সে
বিশ্বে প্রকাশে।

এই শরত আলো নেব আমি
বক্ষে
অরূপ তাঁহার রূপ-মাধুরী
চক্ষে।

এই শরতেরি ফুলের রাশে
শিশির সজল ঘাসে ঘাসে
নৃত্য করি ফেরেন ঠাকুর
আনন্দে উল্লাসে॥

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল।

# —ভবিতব্য—

বসন্তের মৃদু হিল্লোল থেকে থেকে পল্লীখানার বুকের ওপর শান্তির অমিয় ধারা ঢেলে দিচ্ছিল। গাছে গাছে কোকিলের কুহুতান, ঝোপের আড়ালে দোয়েল, পাপিয়ার কমনীয় কণ্ঠ, চৈত্রের অপরাহ্নটিকে অতি মনোরম করে তুলেছিল। বারোয়ারী তলায় ছেলের দল একটা থিয়েটারের রিহার্সেল দিতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। তারি অদূরে একটা ভাঙ্গা আটচালায় তক্তাপোষের ওপর বসে নিষ্কর্ম্মা গ্রামবাসীরা তাস, পাসা, দাবা খেলার ফাঁকে মাঝে মাঝে পরনিন্দারূপ সদালাপে মজ্‌লিস গুল্‌জার করে তুল্‌ছিল।

এই সময়ে ঘোষাল বাড়ীর ঘোষাল গৃহিণী কন্যার বিয়ের জন্য পিঁড়ির ওপর আল্‌পনা দিতে লেগে গেছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছিল পাড়ার যত অকর্ম্মা কুমারী মেয়েগুলি।

এ বিষয়ে কন্যার নিকট একটু সাহায্য পাবার আশায় ঘোষাল গৃহিণী সাধনাকেও ধরে কাছে বসিয়েছেন। নত মস্তকে নীরবে বসে সে মায়ের আদেশ পালন করে যাচ্ছিল। হঠাৎ ছোটবোন কুন্তলা এসে তার কানের কাছে অনুচ্চস্বরে বল্‌লে, দিদি বাগানে আস্‌বে, অনেকগুলো ভাল আমের সন্ধান করে এসেছি। কথাটা মায়ের কাণেও পৌঁছে গেল। তিনি কন্যার দিকে ফিরে বল্‌লেন, এই পড়ন্ত রোদে আম বাগানে গিয়ে হৈ চৈ করতে হবে না, যা কাজ কর্চ্ছিস্ কর। কিন্তু রসনা-রুচিকর অপক্ক ডাসা আমগুলির লোভ সম্বরণ

অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছিল। দূর থেকে একবার তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে লগি হাতে শচীনাথ ধীরে ধীরে সেখানে এসে উপনীত হ'ল।

প্রতিবাসী হলেও শচীনাথের সঙ্গে ঘোষাল বাড়ীর খুব ঘনিষ্ট আত্মীয়তা ছিল, এ বাড়ীর যেখানে সেখানে তার অবারিত দ্বার, তা জানা সত্ত্বেও হঠাৎ কোমর বাঁধা অবস্থায় তার সাম্‌নে পড়ে যাওয়ায় সাধনা অত্যন্ত বিরক্তিভরে সবেগে হাতের বাখারিখানা ভূতলে নিক্ষেপ করে, একটা ঝোপের মধ্যে সরে গেল।

কুন্তলা ঝোপের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো, ত্রস্তে সে কাপড় গুছিয়ে পরছে। সে কৌতুকভরা হাস্যে বল্লে, অত লজ্জা কেন গো, শচীদা কি তোমার বর, এসো না দিদি। এ কথায় সাধনা ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এল এবং সজোরে তার গাল টিপে দিয়ে বল্‌লে, আ মরণ লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, কথার ছিরি দেখনা।

বেদনায় কুন্তলা আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

—বল আর বলবি না কখনো ও কথা।

হঠাৎ গালের ওপর টিপুনি খেয়ে কুন্তলার রাগ ধরে' গিয়েছিল। খানিকটা দূরে সরে গিয়ে দুষ্টামীমাখা হাস্যে অধর রঞ্জিত করে তাই সে বল্‌লে—বল্‌বো—বল্‌বো—বল্‌বো।

——ফের! দাঁড়া দেখাচ্ছি।

গমনোদ্যতা সাধনার গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে শচীনাথ কৌতুক হাস্যভরা গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বল্‌লে—"ওকে তুমি কিছুতেই টিট করতে পারবে না সাধন। ঝগড়া করে মিছে সময় নষ্ট না করে চল বরঞ্চ আম তলায় যাই আমরা।

দূর থেকে কুন্তলা আবার চেঁচিয়ে বল্‌লে, যাওনা গো, বর ডাক্‌ছে—অমন চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

নিষ্ফল ক্রোধে সাধনার মুখ আগুনের মত লাল হয়ে উঠ্‌ল আর কোন্ অনাগত দিনের কথা স্মরণ করে' শচীনাথের মুখ ভোরের শুকতারার মতন জ্বল্ জ্বল করতে লাগলো।

( ২ )

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আম বাগানে ছুটোপাটি করে' শচীনাথ যখন বাড়ী ফিরলো, তখন তার দেহ মন কি যেন এক গভীর চিন্তাভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। কোথা দিয়ে কেমন করে যে সাধনার চিন্তা তাকে আক্রমণ কল্লে তা সে কোন মতেই বুঝে উঠতে পাল্লে না। ছোটবেলা থেকেই সে সাধনাকে দেখছে। ছোট বোনটির মত কত তাকে আদর যত্ন করে এসেছে কতদিন কত খেলনা দিয়ে, গল্প বলে তার মন ভুলিয়েছে; তার কত আব্দার নীরবে সহ্য করেছে। কিন্তু কোনদিন তো সাধনার চিন্তা তাকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেনি।

আজ ক্ষণে ক্ষণে সে তার সারা দেহ মনে একটা পুলক-শিহরণ অনুভব কর্‌ছিল। একটা ছোট্ট বাসনার ঢেউ তার অন্তর সমুদ্রে খেলে যেতে লাগল। একখানি সলজ্জ সুখ গোপনে গোপনে তার প্রাণের তলে যে ধীরে ধীরে নিজের আসন বিস্তার করে নিচ্ছিল, তাকে রোধ করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তার লোপ পেয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে একটা দারুণ অনুতাপ ও আত্মগ্লানিতে তার অন্তর ভরে উঠলো,—সেই দিন না সেই তার এক প্রবাসী বন্ধুর সঙ্গে সাধনার বিয়ের সব ঠিকঠাক করে দিয়েছে।

বিকেলে তুলসী মঞ্চের কাছে বসে তারাসুন্দরী হরিনামের মালা জপ্‌ছিলেন, আর নিকটে বসে শচীনাথ দুই একটা বাজেকথা বলে জননীকে অন্যমনা কর্‌বার চেষ্টা কচ্ছিল। এই সময়ে এক্‌খানি

কচ্ছি, তুমি যদি কিছু মনে না কর, তবে বলি সাধন। মাসিমা কোথায় ?

মা ঘাটে, কি কথা বলনা শচীদা।

শচীনাথ তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, আমার কাছে কিছু লজ্জা কোরনা, আমি তোমায় লজ্জা করবার কেউ নই। তোমার সুখেই আমি সুখী। তোমাকে কিসে সুখী করবো এই আমার ভাবনা। কিসে তোমার ভাল হবে সর্ব্বদাই আমি তাই চিন্তা করি। তুমি যদি বল এ বিয়ে তোমার ঠিক মনের মত হচ্ছে না, তা হ'লে এখনও তোমার এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে পারি। দেখ সাধনা, এখন লজ্জার সময় নয়; স্ত্রীলোকদের পক্ষে এ সময়টা একটু ভেবে দেখা উচিৎ। ইহ জীবনে এ ভুল শোধরাবার আর সময় পাবেনা। এই বলে' শচীনাথ জিজ্ঞাসু নেত্রে সাধনার দিকে তাকালো।

সাধনা এ কথার কি উত্তর দেবে ভেবে পেলেনা। মাতা-পিতার নির্দ্ধারিত পাত্রকেই যে দেশের কুমারীরা সিংহাসনে বসিয়ে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে থাকে, সে সেই দেশের মেয়ে, সেই পবিত্র হিন্দু কুলের দুহিতা, এতে তার আবার ভুল বা ভাববার কি আছে। সে একটু বিস্মিত হ'য়ে বসে' রইল, কোন উত্তর কল্লে না।

বল সাধনা, আমার কথার উত্তর দাও। তার কণ্ঠস্বরে অবাক' হয়ে সাধনা দেখলে শচীনাথের চোখে মুখে কেমন একটা অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা ফুটে উঠেছে; জীবনে আর কখনো সে তাকে এমন চঞ্চল হতে দেখেনি। সে এবার আস্তে আস্তে বল্লে, মা বাবা যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছু ভুল ভাবনা আমার মনের মধ্যে নাই, কেন আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ শচীদা ?"

এর পর শচীনাথ যা বলতে এসেছিল তা আর বলা হ'ল না, উচিৎও

কোন রকমে কম্পিত পা দুখানিকে কোন রকমে সভাগ্রাঙ্গনে টেনে নিয়ে এসে সকলকে লক্ষ্য করে বললে, ভাববার কোন প্রয়োজন নেই, আমিই এই বিয়ের পাত্র। শুধু আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে।

সকলে ক্ষণেক নীরব থেকে তারপর একটু এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বিয়ের সভায় নিয়ে গেলো। বাইরে আবার সানাই বেজে উঠল।

শ্রীরাধারাণী ঘোষজায়া।

ইতি